দেশ কাল মানুষের — আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১৯ সংখ্যা ❖ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ

- দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি ও এস আই আর — মনীষা ব্যানার্জি — ৩
- ধর্মনিরপেক্ষতা — শুভ বসু — ৫
- শিক্ষা সংকট — সিদ্ধার্থ সেন — ৬

বাংলাদেশ

- বিএনপি-র ভূমিধ্বস জয়ের পরে আপাতত শান্তিকল্যাণ বাংলাদেশে — মিলন দত্ত — ৯
- বাংলাদেশের নির্বাচন— এখন যা করতে হবে — তসলিমা নাসরিন — ১৩

অর্থনীতি

- বাজেট থেকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি সরকার শক্তের ভক্ত গরিবের যম — অমিত দাশগুপ্ত — ১৩
- ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতের পক্ষে কি আদৌ লাভজনক ? — সৌর বসু — ১৬
- ভারত মার্কিন বানিজ্য চুক্তি— ট্রাম্পের চোখ রাঙানির কাছে মোদীর অসহায় আত্ম সমর্পণ — অমিতাভ সিংহ — ১৮

আন্তর্জাতিক

আধিপত্যবাদের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চিরতুষারের দেশ গ্রীণল্যান্ড — মনিরুল হক — ১৯

দেশের খবর

- প্রাক্তন সেনা প্রধানের লেখা বই থেকে রাহুল গান্ধির উদ্ধৃতি দেবার প্রচেষ্টায় ক্রমাগত বাধাদান। — অমিতাভ সিংহ — ২১
- সুপ্রিম কোর্ট বাংলার এস.আই.আর-এর সময়সীমা বাড়াল, সন্দেহ ও আশংকা থেকেই গেল — সুকুমার মিত্র — ২৩
- ডি.এ.মামলার ঐতিহাসিক রায় এবং সরকারি কর্মচারী আন্দোলন — শ্যামল কুমার মিত্র — ২৫
- ২০০২ সালের ভোটারও শুনানির নোটিশ পাচ্ছে : মুস্তারি বানুর মামলা — প্রসেনজিৎ দত্ত — ২৮

আপনজনের কথা

- আরজ আলি থেকে আমির চাঁদ — অরুণাভ মিশ্র — ২৯
- বিজেপির মিথ্যা অভিযোগে সাসপেন্ড জনপ্রিয় মুসলিম প্রধানশিক্ষক পুনর্বহাল — সুকুমার মিত্র — ৩০
- তুঝে সালাম — পার্থপ্রতিম বিশ্বাস — ৩০

স্মরণ

- নিরঞ্জন হালদার (১৯৩২-২০২৬) — ৩১
- রমেশ চন্দ্র সেন — ৩১
- সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক — ৩৩

ইতিহাস

- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও মহাত্মা গান্ধি — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ৩৩
- বন্ধুতার পাতা সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন : একটি সতর্ক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে যে চিত্র উঠে এসেছে, তা নিছক একটি পরিসংখ্যান নয়;এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীর সংকট এবং জনগণের নীরব প্রতিবাদের প্রতিফলন। প্রায় ৫২ শতাংশ ভোটারের ভোট বর্জন, ফাঁকা ব্যালট বাক্স এবং ভোটারশূন্য কেন্দ্রগুলো প্রমাণ করেছে যে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র কার্যত অর্থহীন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬ কোটি ৬৫ লাখ ভোটার অংশ নেননি। এই অনুপস্থিতি নিছক উদাসীনতা নয়, বরং একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা। জনগণ দেখিয়েছে যে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে ভোটের উৎসব অর্থহীন। অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, এটি শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনমতের অকৃত্রিম প্রতিবাদ।যদিও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী ও আওয়ামী লীগের সমর্থক অনেক মানুষ জামাত এ ইসলামীকে প্রতিহত করার জন্য বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন বলেও অনেকে মনে করছেন।

মহম্মদ ইউনুসের অনির্বাচিত সরকার (কার্যত একটা এনজিও সরকার) শুরু থেকেইচরম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী।জুলাই আন্দোলনের সময়ে এদের স্লোগান ছিলো ‘আমরা কারা রাজাকার, রাজাকার — কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার।’ প্রকৃত পক্ষে ইউনূস সাহেব স্বীকার করেন জুলাই আন্দোলন ছিল Meticulous design আর উনি এখন রিসেট বাটন টিপে মুক্তিযুদ্ধর ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। গত দেড় বছর ধরে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, দেশের স্বাধীনতাকে নিচু করা হয়েছে তা সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কার বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের চেতনায় রয়ে গেছে।

যারা ‘সংস্কারমূলক’ নির্বাচন দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান তুলেছিলেন, তাদের কাছে এই ফলাফল এক জোরালো চপেটাঘাত। বিএনপি বা অন্যান্য দলের বিজয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে, কারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো নির্বাচন বৈধতা অর্জন করতে পারে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একে ‘প্রহসন’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শেখ হাসিনার অনুপস্থিতি এই নির্বাচনে এক ধরনের নৈতিক বিজয় এনে দিয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে , কৃষির অগ্রগতি , মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি , শিশুমৃত্যুর হার কমানো, গড় আয়ু বৃদ্ধি , নারীর ক্ষমতায়ন , স্বয়ম্ভর অর্থনীতি এসব উন্নয়নের স্থপতিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র চালানোর চেষ্টা জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। ভোটারদের অনুপস্থিতি প্রমাণ করেছে যে জনগণ আবারও সেই ‘লোহার মানবী’কে খুঁজছে, যিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন।

জনগণের নীরব প্রতিবাদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এবং শেখ হাসিনা একই সূত্রে গাঁথা। একে বাদ দিলে অন্যটি অচল;এই বার্তাই জনগণ দিয়েছে তাদের নীরব কান্না ও প্রতিবাদের মাধ্যমে। এই ভোট বর্জন নতুন সরকারের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং আওয়ামী লীগের পুনরাগমনের পথ সুগম করবে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে জনগণ আবারও সেই নেতৃত্বকে খুঁজছে, যিনি উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রতীক।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাই বাংলাদেশের গণতন্ত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। এটি দেখিয়েছে যে জনগণ কেবল ভোটের মাধ্যমে নয়, অনুপস্থিতির মাধ্যমেও তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারে। শেখ হাসিনার অনুপস্থিতি জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য;এটাই এই নির্বাচনের মূল বার্তা। এই নীরব বিপ্লব ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সমীকরণকে পাল্টে দিতে পারে এবং আওয়ামী লীগের পুনরাগমনের পথকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

প্রবন্ধ

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি ও এস আই আর

মনীষা ব্যানার্জি

১৮৯৫ সালের শেষের দিকে ৫০ পাতার একটি প্যামফ্লেট প্রকাশিত হল দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে।ঞ্চ লেখক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি একজন অসফল উকিল কিন্তু সেখানকার ভারতীয়দের নেতা হয়ে উঠেছেন কম বয়সে। বিষয় ছিল দি ইন্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজ, অর্থাৎ ভারতীয়দের ভোটাধিকার। যে অধিকার খর্ব করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সরকার। সেই লেখায় গান্ধী সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত স্তরে ভারতীয়দের অবদান উল্লেখ করে স্পষ্ট বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোনোখানে তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর চেষ্টা অন্যায়।

আজ ১৩০ বছর বাদে বিষয়টা খানিকটা চেনাচেনা লাগছে না? মনে করে দেখুন, আজ ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, পরিকল্পিতভাবে বিরাট সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনার নাম বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)। ফলে এবারে গণতন্ত্র দিবসে গণকে আমরা দেখলাম, বলা যেতে পারে গণদেবতাকে দেখলাম, হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে আসছেন তথ্য যাচাই কেন্দ্রে। গোটা দেশ আজ তন্ত্রের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে। বিষয়টা খানিকটা একইরকম।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, দক্ষিণ আফ্রিকা অভিবাসন সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছিল। গোটা বিশ্ব থেকে, বিশেষ করে ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার এবং আরব দেশগুলি থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ সেখানে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গরা এই লোকগুলিকে ঠিক ততটাই ঘৃণা করত, যতটা আজ বাংলাদেশীদের ঘৃণা করতে শেখানো হচ্ছে আমাদের। অথচ তারা সকলে একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় একথা বলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা তৈরি হয়েছে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের রক্ত, ঘাম ও শ্রম দিয়ে। সেখানে গুজরাটি, তামিল, হিন্দু, মুসলমান, বণিক, শ্রমিক , সকলেই আছে।ঞ্চ দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি পাওয়ার পর ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার আইন আর কার্যকর করা হয়নি। গান্ধীর তখন দেশে ফেরার কথা, কিন্তু এই ঘটনার পরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই রয়ে গেলেন এবং ঘটনাক্রমে তৈরি করলেন টলস্টয় ফার্ম। তাঁর সমবায়ী জীবনযাপনের সূত্রপাত ঘটল, যা থাকবে আজীবন।

কিন্তু আজকের হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং তাঁর দলের মতই, যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিরন্তর উত্যক্ত করা, তাদের নতুন নতুন পরিকল্পনা সেকালেও আসতেই থাকত। ১৯০৬ সাল নাগাদ আদেশ হল, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ট্রান্সফারে ভারতীয়দের পাস নিয়ে ঘুরতে হবে। প্রত্যেককে সর্বদা আঙুলের ছাপ সহ তাদের সমস্ত তথ্যসম্বলিত একটি নথি বহন করতে হবে। আট বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেককে নতুন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে। সেই কাগজ না থাকলে সে অনুপ্রবেশকারী (পড়ুন ঘুসপেটিয়া) হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং শাস্তি পাবে। পনেরো হাজার ভারতীয়ের চলাফেরায় বাধা পড়ল।ঞ্চ তখন একজন ভারতীয় অভিবাসী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'আমি আপনাকে আমার কাগজপত্র দেখাব না।' সেখানেই থামলেন না তিনি।ঞ্চ প্রকাশ্যে কাগজগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকেই।ঞ্চসত্যাগ্রহের সূচনা হল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে। প্রস্তুতি পর্বে ছিল সেই অসাধারণ সভা।

অদ্ভুতভাবে, তারিখটি ছিল ৯/১১ বা ১১ সেপ্টেম্বর। জোহানেসবার্গের এম্পায়ার থিয়েটারে কানায় কানায় মানুষ। সভাপতিত্ব করেন ব্যবসায়ী আব্দুল গনি। মানুষ জেল যেতে প্রস্তুত, তবু নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করাবেন না। এই নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রতিবাদ জানানোর পরেও সরকারের অনড় মনোভাবে সরাসরি প্রতিবাদের পথ নেওয়া হল। এদিকে প্রতিপক্ষ হয়ে এসেছেন জেনারেল স্মাটস। জন স্মাটস ছিলেন তাঁর সময়ের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কেমব্রিজ স্নাতক, বোয়ার কমান্ডো, রাজনীতিবিদ, ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল ক্যাবিনেট মন্ত্রী, দার্শনিক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রনায়ক।

অনেকের মতে, তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সবচেয়ে প্রভাবশালী দক্ষিণ আফ্রিকান ছিলেন। তাঁর কঠোরতার কারণে প্রতিপক্ষ গান্ধী জেল, মিছিল এবং অনশনের মত অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হন, যা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োগ করেছিলেন। স্মাটস এবং গান্ধীর মধ্যে আট বছর ধরে চলা সেই দ্বন্দ্বই ছিল গান্ধীর সত্যাগ্রহকে পরিপক্ক করে তোলার পরীক্ষাগার। এই জেলপর্বে একটা সময়ের পর আলোচনা শুরু হত। গান্ধী তাঁর দাবি থেকে খানিকটা সরে আসতেন, স্মাটসও তাঁর অবস্থান নরম করতেন। খানিকটা আপস করা হত এবং জনসাধারণ স্বস্তি পেত। কিন্তু তারপরই নতুন সমস্যা তৈরি হত।

পরের সমস্যা তৈরি হল বিয়ে নিয়ে। ১৯১৩ সালের মার্চে যে আইন এল, তাতে হিন্দু এবং মুসলমান বিবাহ পদ্ধতিকে একরকম অবৈধ করে দেওয়া হল। আজকের এসআইআরে যেমন নতুন সমস্যা

যুক্ত হয়েছে বিয়ের বয়স নিয়ে। সন্তান এবং জননীর বয়সের ফারাক হয়ে উঠছে সন্দেহজনক, কোন বিজ্ঞান মতে তা কেউ জানে না। কে কবে কাকে বিয়ে করেছিলেন, সেটাও এখন নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রমাণ হয়ে উঠছে। এই নিয়ে অমর্ত্য সেনকেও নোটিশ পাঠানো গেছে। ভারতরত্নই হোন আর নোবেল বিজেতাই হোন, মা কোন বয়সে মা হয়েছিলেন সেটাই নাগরিকত্বের নতুন প্রমাণ। চারিদিকে মানুষ নিত্যনতুন হেনস্থায় জর্জরিত। যাঁরা কাগজ দেখাবেন না বলছিলেন, তাঁরাও ছোটবেলার ইস্কুলে গিয়ে কাগজ খুঁজছেন।

কিন্তু ১১৩ বছর আগের মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন। এই প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন কস্তুরবার মত ভারতীয় মেয়েরা, যাঁদের চার দেওয়ালের মধ্যে দেখতেই সমাজ অভ্যস্ত ছিল। এই মেয়েদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তামিল মেয়েরা।ঔপনিবেশিক রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা এল। পাস ছাড়াই মেয়েরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে থাকলেন। ইতিহাস বলছে, তামিলভাষী ১২ জন মহিলা, যাঁদের একজন অন্তঃসত্ত্বা আর ছজনের কোলে শিশু, টলস্টয় ফার্ম থেকে বেরিয়ে সীমান্ত পেরোলেন। প্রথমে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, তারপর সেটি পেরিয়ে নাটাল। শেষপর্যন্ত গ্রেফতার হতে হল। কস্তুরবাও গ্রেফতার হলেন।ঞ্চ এই গ্রেফতার আগুন ধরিয়ে দিল। উত্তর নাটালের অপেক্ষাকৃত শান্ত অঞ্চলে খনির পর খনিতে কাজ থেমে গেল, দক্ষিণ আফ্রিকার মন্দিরে, মসজিদে, খোলা মাঠে ভারতীয়রা প্রতিবাদ সভা করতে লাগলেন। জেলের কঠিন পরিবেশ, সশ্রম কারাদণ্ডের পর কস্তুরবা যখন ছাড়া পান, তখন তাঁর কংকালসার চেহারা দেখে সবাই শিউরে উঠলেন। দীর্ঘদিন তাঁর দেখভাল করেন গান্ধী, পাশাপাশি চলে আন্দোলন।

এরপরেই শুরু হয় সেই দীর্ঘ পদযাত্রা, গান্ধীর জীবনে যা ফিরে ফিরে আসবে। কালা কানুনের পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের উপর চাপানো করের প্রতিবাদও ছিল আন্দোলনের বিষয়। সেই যাত্রায় সবধরনের মানুষ সাথে ছিলেন।ঞ্চ নিদারুণ কষ্ট সয়েছেন সবাই। গান্ধীকে আবারও জেলে যেতে হয়েছে।

স্মাটস গান্ধীকে কমপক্ষে দশবার গ্রেফতার করেছিলেন, চারবার দীর্ঘ সাজা দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৩ সালের নভেম্বরে তাঁকে শেষবারের মত গ্রেফতার করা হয়, ১৯১৪ সালে তিনি মুক্তি পান। এই সময়ের মধ্যে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলের কাছ থেকে বারবার ভারত সফরের আমন্ত্রণ পেতে থাকেন। দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারাগারের শেষ আট মাসে সময় কাটানোর জন্য গান্ধী জুতো তৈরি করা শিখেছিলেন এবং স্মাটসের জন্য একজোড়া স্যান্ডেল তৈরি করেছিলেন। স্মাটসকে তিনি সেই জুতোজোড়া দিয়েছিলেন একই লড়াইয়ের দুই বিপরীত প্রান্তে থাকার স্মৃতি হিসাবে।ঞ্চস্মাটস জীবনের শেষের দিকে লেখেন ‘আমি অনেক গ্রীষ্মে সেই স্যান্ডেল পরেছিলাম। কিন্তু আমার সবসময় মনে হত, যে আমি সেই মহান ব্যক্তির জুতো পরার যোগ্য নই।’

পরবর্তীকালে স্মাটস ২০ বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আমলে বর্ণবৈষম্য (apartheid) পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয় এবং সেই সংগঠন একটি মানবাধিকার সনদ তৈরি করে। জেনারেল স্মাটসই সেই সনদটি লিখেছিলেন। এটি স্পষ্টভাবে গান্ধীর অহিংসা এবং মানুষের মধ্যে সমতার শিক্ষাকে প্রতিফলিত করে।

গান্ধীর চলার কথা লিখেছিলেন তার প্রথম জীবনীকার জোসেফ ডোক, জোহানেসবার্গ ব্যাপটিস্ট চার্চের রেভারেন্ড। জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ সালে, যখন গান্ধীর জীবনের বড় অংশই যখন বাকি। ডোক দেখেছিলেন, ইনি সেই ভারতীয় নেতা নন যাঁর চেহারা লম্বা, রাজকীয় এবং মুখ সাহসী প্রভুত্বকামী। বরং ইনি একজন ছোটখাটো কালো চামড়া, কালো চোখের বিশ্বস্ত মুখ। গান্ধীর বারবার জেলে যাওয়া অনেককে বিহ্বল করত। কিন্তু ডোক তখনই দেখেছেন, গান্ধী সব সমস্যার মধ্যে বরাবর তাঁর দেশের সবচেয়ে নিচে থাকা মানুষটির যন্ত্রণার শরিক হয়ে পাশে থেকেছেন। এশীয় নেতারা সবাই তাই করেছেন। লাইসেন্স না থাকার জন্য যখন হকারদের গ্রেফতার করা হল, তখন ওই সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত ধনীরা হকার হয়ে গেলেন। ঞ্চমসজিদের ইমাম, ব্রিটিশ ভারত অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, চীনা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি , সবাই পথে ঝুড়ি নিয়ে ফল, তরকারি বেচতে গেলেন পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের। ডোক শেষবার গান্ধীকে দেখছেন আড়াইশো মানুষের সঙ্গে আনন্দে জেলে যেতে।ঞ্চ খ্রিস্টিয় ভাবনায় বিশ্বাসী ডোকের মনে হচ্ছে, তিনি যেন জেরুজালেম চললেন ক্রুশবিদ্ধ হতে। পরক্ষণেই ভাবছেন, এক নতুন জেরুজালেম, যার সুন্দর দরজা সব জাতির জন্য চিরউন্মুক্ত।

এই গান্ধীকে পরে দেখা গেছে নোয়াখালিতে নড়বড়ে সাঁকোর উপর হেঁটে চলা ‘নাছোড় ভগবান’ হয়ে দগ্ধ বসতি নরসংহারের নরকে ভালোবাসার বীজ বুনতে। ‘মেলাবেন তিনি মেলাবেন’। দেখা যাবে বিহারে, দিল্লিতে। তাঁর প্রার্থনাসভায় গাওয়া হয়, ঈশ্বর আল্লা যেন সবাইকে সন্মতি দেন। যে গান আজকের ভারতে গাইতে দেওয়া হয়নি, অত্যাচারীর চোখের দিকে তাকিয়ে যে অহিংস আন্দোলনের কথা বললে আজ দেশদ্রোহী হয়ে জেলে পচতে হয় উমর খালিদ, শার্জিল ইমাম বা সোনম ওয়াংচুক হয়ে।

এই যাত্রা গান্ধী আবার করতে চেয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের পথে। একজন পাকিস্তানি যেমন কল্পনা করছিলেন, ৫০ কিলোমিটার লম্বা যাত্রায় গান্ধীর পিছনে উদ্বাস্তু হিন্দুরা। কী আশ্চর্য হত সেই দৃশ্য! গান্ধী ঠিক করেছিলেন, তিনি পুলিশ নিয়ে, সেনাবাহিনী নিয়ে যাবেন না। কারণ তিনি এই রাষ্ট্র মানেন না। নেশন স্টেটের বিরুদ্ধে তিনিই, ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত 'অ্যান্টি-ন্যাশনাল'।

সেই যাত্রার আগেই গান্ধীর নশ্বর পথচলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৩০ জানুয়ারি, সর্বধর্ম প্রার্থনার খানিকক্ষণ আগে।

আমরা কি ভাবতে পারি মালদহের সীমান্ত দিয়ে ঢুকছেন সোনালী বেগম ও সুইটি বিবি, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তঃসত্ত্বা ও শিশু কোলে মেয়েদের মত? তাঁদের নিতে এসেছেন মাঝারি মাপের হাতে লাঠি, গায়ে চাদর চিরচেনা সেই মানুষ? তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গোটা ভারতের আপামর জনসাধারণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, দেশের মেয়েকে দেশে ফেরাতে?

'Oh– India– dare to be worthy of your Gandhi.' পার্ল বাখ বলেছিলেন।

সময় আসন্ন।

(লেখিকা লাভপুর সত্যনারায়ণ শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা)

ধর্মনিরপেক্ষতা

শুভ বসু

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল ধর্মকে রাষ্ট্রের বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই শব্দটির যাত্রা শুরু হয় ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, ইউরোপে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধীরে ধীরে জীবনের একটি উপায় হয়ে ওঠে। প্রথমে খ্রিস্টান ভিন্নমতাবলম্বীরা এসেছিলেন এবং তারা নাগরিক স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন। তারপর আমরা দেখতে পাই যে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে। একজন জার্মান দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদ, রেইনহার্ড কোসেলেক দাবি করেন যে, ধর্মতত্ত্বের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার সাথে সাথে, গির্জা ধীরে ধীরে মানুষের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। আলোকিতকরণ, বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ, ইতিবাচকতাবাদ, বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং উদারনীতির দার্শনিক প্রভাব ধর্ম এবং ক্যাথলিক চার্চের বৌদ্ধিক এবং রাজনৈতিক ভূমিকার উপর প্রভাব ফেলে এবং শেষ করে, যা তখন ইউরোপের প্রতিষ্ঠিত গির্জা ছিল, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, গ্রেট ব্রিটেন এবং, গুরুত্বপূর্ণভাবে, প্রুশিয়া বাদ দিয়ে। গির্জা এবং রাষ্ট্রের আইনগত পৃথকীকরণের মাধ্যমে, যুক্তির যুগ চার্চের প্রতি সমাজের আর্থিক ঋণ কমিয়ে দেয় এবং সমাজের জনসাধারণের ক্ষেত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলে এবং সমাজের সকলের জন্য জনশিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সমাজের একটি স্থিতিশীল ধর্মনিরপেক্ষকরণও ঘটে। প্রুশিয়ার মতো রাষ্ট্রও ১৮৭১-৭৮ সালের মধ্যে সাত বছর ধরে কুলতুরক্যাম্পে লড়াই করেছিল (২)। ধর্মনিরপেক্ষকরণের সমাজতাত্ত্বিক বিতর্কে, এর ব্যাখ্যার দুটি ভিন্ন পদ্ধতি একসাথে বোনা হয়েছে ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য এবং (ব্যক্তিগত) ধর্মীয়তার পতন।

ইউরোপের উন্নত শিল্প সমাজের বিপরীতে, দক্ষিণ এশিয়ায়, ধর্ম নিয়ে বিরাট বিতর্ক সত্ত্বেও, সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণ খুব ধীর গতিতে এগিয়েছিল। ভারত ছিল একটি বহুমুখী সমাজ যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, সম্প্রদায় এবং রীতিনীতি একে অপরকে ছেদ করে। এই জটিল সামাজিক মোজাইক দ্বারা বিভ্রান্ত ঔপনিবেশিক শাসকরা সমস্ত অমুসলিমকে ডাকতে শুরু করে এবং এইভাবে একটি আঞ্চলিক শব্দকে ধর্মীয় শব্দে রূপান্তরিত করে। আদমশুমারির মাধ্যমে গণিত পরিচয়ের উপর ঔপনিবেশিক জোর ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির সম্মিলিত জনসংখ্যাগত গুরুত্বকে আরও জোরদার করেছিল। সীমিত গণতন্ত্র প্রবর্তনের তাদের প্রচেষ্টা ধর্মীয় যোগ্যতাকে ভোটারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে তুলে ধরে। জনসাধারণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উদযাপন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনী এলাকা নিয়ে কুৎসিত প্রতিযোগিতা ধর্মীয় পার্থক্যকে তীব্র স্বস্তি এনে দেয়। তদুপরি, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের পবিত্রতা ও দূষণের রীতি, শ্রেণী গঠনের ধরণ সহ, ধর্মীয় বিভাজনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে, গান্ধী সহনশীলতা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সত্যের বহুমাত্রিকতার জৈন ধর্মীয় মতবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন, যার দিকে পরিচালিত সমস্ত পথের উপর জোর দিয়েছিলেন। ঠাকুর ঈশ্বরকে মানবিক কল্যাণের সমষ্টি হিসাবে ভাবতেন এবং আধ্যাত্মিকতাকে জাগতিক দৈনন্দিন ধর্মীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে চুক্তির সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। জিন্নাহ এবং

তিলক লখনউ চুক্তি সংগঠিত করেছিলেন, গান্ধী খিলাফত প্রশ্ন গ্রহণ করেছিলেন এবং সি. আর. দাস বেঙ্গল চুক্তি সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত চুক্তি ক্ষণস্থায়ী হয়ে ওঠে। ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ রাজনীতির প্রাণশক্তি হয়ে ওঠে। দুটি শক্তি, মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদ, রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কংগ্রেস নেতারা অসহায় হয়ে পড়ে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতকে গ্রাস করে। মুসলমানরা ভারতে বসবাসের জন্য অনিরাপদ বোধ করায় এবং হিন্দুরা মুসলিম-অধ্যুষিত বাংলা ও পাঞ্জাবে বসবাসের জন্য অনিরাপদ বোধ করায়, এই অঞ্চলগুলিতে সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করে এবং অবশেষে ভারত, বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায়, অনেকে নতুন আবাসভূমি অর্জন করে, কিন্তু সংখ্যালঘুরা হারিয়ে যায়। পাঞ্জাবে সহিংস জাতিগত নির্মূলের ঘটনা ঘটে এবং বাংলায়, বিভক্তির ক্ষত রক্তপাত অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে ওঠে।

নেহেরু এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ছিল, কিন্তু তিনি কংগ্রেসে সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। প্যাটেল রাজেন্দ্র প্রসাদ, গোবিন্দ বল্লভ পন্ত এবং পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন তাঁর সাথে একমত ছিলেন না, যদিও তারা ধর্মীয় ঐতিহ্যবাদী ছিলেন এবং হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ বা আরএসএসের মতো চরম ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। আরএসএস রাজনৈতিক নির্বাসনে থেকে যায় কিন্তু দৈনন্দিন সংগঠন গড়ে তোলার উপর মনোনিবেশ করে এবং সাধারণ জ্ঞানের পরিভাষায় পরিবর্তনের জন্য ধীর কিন্তু অবিচল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। জনসঙ্ঘ, যদিও আরএসএস-এর সহযোগী ছিল , তবুও স্বাধীন দলের মুক্তবাজার মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল। রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার সমাধানের প্রস্তাব করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মনিরপেক্ষকরণ এড়ানো হয়েছিল বরং একটি সাধারণ সংস্করণ উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং এটি কাজ করেছিল। দৈনন্দিন ভাষায়, ১৯৭৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অমর আকবর অ্যান্থনির মতো চলচ্চিত্রের দর্শন এটি ছিল যখন ভারত জরুরি অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছিল।বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা আমূলভাবে এগিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে, রাষ্ট্রটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আছে, হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান আছে, এবং বাংলাদেশই সেই জায়গা যেখানে সমস্ত বাঙালি, একটি ভাষাগত গোষ্ঠী, স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, বাম ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক অনৈক্য , দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্রের পরীক্ষাকে দুর্বল করে দেয়। অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ধর্মের প্রবর্তন করে। এভাবে, বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ তাদের আকর্ষণ এবং আবেদন হারিয়ে ফেলে।

ভারতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ব্লকের পতনের সাথে সাথে বিশ্ব রাজনীতিতে এক টেকটোনিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আরএসএস রামজন্মভূমির মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা আফগানিস্তানে জিহাদ এবং ইরানে ইসলামী বিপ্লব ধর্মনিরপেক্ষ আরব রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করে দেয় এবং ভারত ধীরে ধীরে আধা ফ্যাসিবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করে। বিন্ধ্য পর্বতমালার ঐতিহাসিক বিভাজন রেখায় গেরুয়া তরঙ্গ থেমে যাওয়ার পরও সহনশীলতার একটি সারসংক্ষেপ এখনও লেখা হয়নি। উপদ্বীপের ভারতীয়রা এখনও গেরুয়া তরঙ্গে মুগ্ধ হয়নি। ভারত এবং বাংলাদেশের ঘটনাবলীর আমার নিজস্ব ব্যাখ্যার একটি বিস্তৃত রূপরেখা আমি প্রদান করেছি। আসুন আশা করি ভারত গেরুয়া ব্রিগেডের দায়িত্ব সামলাতে পারবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আরও একটি ধারা তৈরি করতে পারবে।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ।)

শিক্ষা সংকট

সিদ্ধার্থ সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

শিক্ষা ব্যবস্থার কফিনে সর্বশেষ পেরেকটি পোঁতা হলো বছর দশেক আগে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর। অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে নতুন National Education Policy SNEP ২০২০) ঘোষণা করা হলো। প্রথাটি অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও কয়েকবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে শিক্ষানীতির পর্যালোচনা করে তার অদলবদল ঘটিয়ে নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

এবারের NEP র নথিটি উপর উপর পড়লে খারাপ কিছু মনে হয় না। অনেক কিছু ভালো ভালো প্রস্তাব আছে, যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে জি ডি পির ৬ করার প্রতিশ্রুতি আছে। আর ৬৬ পাতার এই নথিতে অনেক ভালো প্রস্তাবনার সাথে দুটি মাত্র প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে যে ছাত্রদের ভারতীয় প্রাচীন কলা ও সংস্কৃতির সম্পদ সমন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে।

উত্তম প্রস্তাব! ভারতের উজ্জ্বল অতীত ও প্রাচীন ভারতে শিল্প, কলা, বিজ্ঞানের চর্চার ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব সবার। কিন্তু তাই করতে গিয়ে কি ইতিহাস বই থেকে পুরো মুঘল যুগের ইতিহাস বাদ দিতে হবে? স্কুলে বিজ্ঞানের পাঠক্রম থেকে ডারউইনের তত্ত্ব, পিরিয়ডিক টেবিল বাদ দিতে হবে? ইদানিং দেখা যাচ্ছে অন্য সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত সরকারের Indian Knowledge System বলে একটি বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার অতিরিক্ত ব্যস্ততা। এই বিষয়টিকে শুধু স্কুল পাঠ্যক্রমে নয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যক্রমের সমস্ত স্তরে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যস্ততার পিছনে অবশ্যই রাজনৈতিকএজেন্ডা যে কাজ করছে, তা বুঝতে সময় লাগে না।

দেশের প্রাচীন কৃষ্টি সমন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের প্রত্যেকটি ভারতবাসীরই দেশে প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার কিভাবে অগ্রগতি হয়েছে, কিভাবে মানুষ নানা প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে সৃজনশীল হয়েছে তা জানা খুবই দরকার। কিন্তু যেহেতু মানুষ স্বভাবে পরিযায়ী এবং দেশের সীমারেখা সময়ের সাথে কোনোদিন স্থির ছিল না, সেই হেতু আমাদের দেশের সাথে আশেপাশের শিল্প সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিভাবে হয়েছে তার ধারণাও থাকা দরকার। আর সেই ইতিহাসের বিবরণ হতে হবে নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে। কোনো মনগড়া কাহিনীর ভিত্তিতে নয়।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রত্নতাত্বিক রত্নভাণ্ডারের বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ ওবিশ্লেষণের পরিবর্তে গণেশের মাথায় প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল কিনা তা প্রাচীন কাহিনী থেকে উদ্ধৃতি দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আর্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতির নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু কি কি পর্যবেক্ষণকরে ও কিভাবে অঙ্ক কষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। অথচ প্রাচীন গ্রীস এবং মিশরে সেই আমলের গাণিতিক প্রমাণ ও জ্যোতির্বিদ্যার অঙ্কগুলি , তাদের প্রাচীন ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ভাবে অন্বেষণ করা ও এব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার কাজ হতে পারত Indian Knowledge System পাঠক্রমের বড় অবদান।

কিন্তু সে রাস্তায় সরকার গেল না। বরং বেছে নিল প্রচার পাবার সস্তা কৌশল। ব্যাপারটা একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ২০১৫ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসে একটি নতুন বিষয়ে আলোচনা বৈঠক শুরু হলো - 'সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান অন্বেষণ' । তাতে এক বিমান শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান একটি গবেষণাপত্র পড়লেন, বিষয় - 'প্রাচীন ভারতীয় বিমান পরিবহন প্রযুক্তি'। অর্থাৎ সেই আমলে পুস্পক রথে চড়ে যে মানুষ যাতায়াত করত তার বর্ণনা। বলাবাহুল্য, কোন জটিল বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিকপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে লেখকরা তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার পথে যান নি; সেগুলি বোঝার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল কিনা সন্দেহ। তবু বিজ্ঞান কংগ্রেসের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোচনা চক্রে সেটি পঠিত হল। আর আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই প্রাচীন ভারতে 'কত কিছু না হত' বলে গুনকীর্তন শুরু করলেন।

বলা বাহুল্য, এই ধরনের অপচেষ্টা বিজ্ঞানী মহল ভালোভাবে মেনে নেন নি। প্রতিবাদ উঠল অচিরেই।কিন্তু সরকার তার মোকাবিলা করল অদ্ভুতভাবে। অচিরেই বাৎসরিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে করার জন্য বরাদ্দ টাকা বন্ধ করে দিল। নানা অজুহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বাৎসরিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একশো বছরের পুরোনো এই বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ করে দেওয়া হল। একই অবস্থা হল ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের সাথে সরকারের সংঘাত আজকি পর্যায়ে চলে গেছে, তার প্রমান পাওয়া যায় গত ২৫শে অগাস্ট ২০২৫ এ ইতিহাস কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহী সভায় সরকারের ইতিহাস বিকৃতি করার প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করা হয়। এর কার্য্যবিবরণীর শুধু প্রথম কয়েকটি লাইন পড়লেই তা বোঝা যাবে। অনুবাদের সীমাবদ্ধতা এড়াতে এই অংশটির উদ্ধৃতি মূল ইংরেজিতেই দিলাম।

"The Indian History congress strongly protests the falsehood– with a clear communal intent being spread among middle and secondary level school children by bringing out a Special Module on Partition Horror Remembrance Day by the NCERT and Ministry of Education– Government of India."

কিন্তু এতখানি স্পর্ধা সরকারের সহ্য হবে কেন ? তাই শুরু হল এই সব স্বশাসিত সংস্থার ক্ষমতা হরণের প্রক্রিয়া। প্রথমতঃ এদের জন্য বরাদ্দ আর্থিক অনুদান কাটছাঁট বা বন্ধ করে দেওয়া হল। সেই সাথে

তাদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে দেওয়া। তিনটি সংস্থা - NCERT – AICTE ও UGC কে মিলিয়েএকটি সংস্থা করা হল। তাদের উপর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। তার জন্য তৈরি হল নতুন সংস্থা। তার এক গুরুচন্ডালি নাম দেওয়া হল— Anusandhan National Research Foundation (ANRF) । ভাব যেন, এতেই দেশের গবেষণার ভারতীয়করণ হয়ে গেল! আর সমস্ত স্বশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণা সংস্থা মাথায় বসানো হতে লাগলো শাসক দলের পেটোয়া লোকজনদের। আগে স্বশাসিত গবেষণা সংস্থাগুলি দেশের বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপকদের নাম নিজেরাই ঘোষণা করে দিত। নিয়ম পাল্টে এখন প্রত্যেকটি পুরস্কারের প্রাপকের নাম ঘোষণার আগে প্রথমে সরকারি অনুমোদন নিতে হয়। শোনা যায়, IIT সহ দেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তার পদে নিয়োগ আজকাল দেশের একটি বিশেষ শহরের একটি বিশেষ সংগঠনের অনুমোদন ছাড়া হয় না। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের পরেও পছন্দের লোক খুঁজে না পেলে শিক্ষাদপ্তর থেকে নিয়োগপত্র আসতে ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লেগে যায়। আর রাজ্যপাল ও রাজ্যের বিবাদে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য বাছতে দু বছরের বেশি সময় লেগে যায়, এবং তাতে সুপ্রিমকোর্টের হস্তক্ষেপ লাগে সে তো আমরা ইদানিং হরবাখত দেখছি। আদতে শিক্ষার উন্নতি হোক, তা নিয়ে কেউ আজ ভাবিত নয়। আসল চ্যালেঞ্জ হল, কিভাবে এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে কায়েম করা যায়। গত এক বছরে IIM গুলির পরিচালন পদ্ধতিতে অনেকখানি পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেক বেড়েছে। ISI র পরিচালন বোর্ড গঠনের পদ্ধতি ও কেন্দ্রীয়সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য একটি বিল এখন সংসদের বিবেচনাধীন।

(৭)

শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আরও অনেক কথাই লেখা যায়, তবে তাতে বর্তমান প্রবন্ধটির দৈর্ঘ্য অনেক বেড়ে যাবে, পাঠকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। আর সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করা একজনের ক্ষমতার বাইরে। এখন প্রয়োজন বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিয়ে শিক্ষা সংকটের সমস্ত দিকগুলি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করা এবং তা থেকে উত্তরণের পন্থা বের করা। তবে শেষ করার আগে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বিশিষ্ট মৃৎ-বিজ্ঞানী ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং National Academy of Science India (NASI) র এক সময়ের সভাপতি নীলরতন ধরের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়ে যেতে চাই। ঘটনাচক্রে ষাট বছরের বেশি পুরোনো এই লেখাটি নতুন করে পেলাম হুঙ্খক্কন্ট প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা School Science এর সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২২ সংখ্যায়। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানচর্চায় বিভিন্ন জাতির অবদানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন— "After the 8th century AD– we in this country never carried on experiments and never accepted the experimental method of science. This seems to be the main reason why we are backward and not so honest in our efforts and actions as an European– who has developed more method and honesty in everyday life. We have been very unlucky because invaders came repeatedly to our land and enslaved us. Instead of following the path of truth– progress and science– we succumbed to moral and mental slavery– and I am sorry to say– this mental slavery seems to be persisting."

এই সাথে তিনি এও লিখেছেন যে, " The age of modern science in India is approximately 60 years whilst in North-West Europe scientists have toiled for nearly 500 years. Hence– we have to be patient and work hard for our national uplift."

দুঃখের কথা হল, আধুনিক মনুবাদীরা যুক্তি, তর্ক, মতবিনিময়, পরীক্ষা নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিকভাবে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার রীতিনীতি ও ধৈর্য্য কোনো কিছুরই ধার ধারে না। ভারতের বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নতি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই এদের। এদের প্রয়োজন কিছু মাথামোটা মানুষ তৈরী করা, যারা এদের অঙ্গুলিহেলনে চটজলদি ঘৃণার তাণ্ডবনৃত্য শুরু করবে। তাই শিক্ষার নতুন পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনও সেই লক্ষ্যেই তৈরি করা।

(শেষ)

(লেখাটির প্রথম খসড়া ১৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ এ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনায় ডাঃ সাধন সেন স্মৃতি বক্তৃতায় পঠিত হয়।)

(লেখক আই.আই. টি ' র প্রাক্তন অধ্যাপক ।)

বাংলাদেশ

বিএনপি-র ভূমিধ্বস জয়ের পরে আপাতত শান্তিকল্যাণ বাংলাদেশে

মিলন দত্ত

যাবতীয় আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ইসলামি দল জামায়াতে ইসলামিকে ধরাশায়ী করে বিএনপি-কে বিপুলভাবে জয়ী করেছেন। মহম্মদ ইউনুসের অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করে রাখলেও বাংলাদেশের বৃহত্তম ওই দলের ভোটাররা দলে দলে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। বিএনপি-র বিজয় নিশ্চিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে; গত শনিবার, পয়লা ফাল্গুন গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়েছে মহা ধুমধামে। মনে রাখতে হবে গত আঠারো মাসে বাংলাদেশে এমন কোনও নাচ-গান-রঙের উৎসব হয়নি, হতে দেওয়া হয়নি। তাহলে কেমন ভোট হল বাংলাদেশে, যা প্রায় রাতারাতি সে দেশকে আবার নিজের জায়গায় ফেরার পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিল!

কেমন হল ভোট

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ অবাধ (যদিও অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়) ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ২৯৭টি সংসদীয় আসনের মধ্যে বিএনপি জয়ী হয়েছে ২১২টি আসনে। বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গেই হয়েছে গণভোট। গণভোটে ৫৯. ৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি জোট মোট ৭৭টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। তার মধ্যে এনসিপি ছয়টি ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দুটি আসনে বিজয়ী হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন ও খেলাফত মজলিস; এই পাঁচটি দল একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে। এছাড়া সাতটি আসনে জয়ী হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর প্রায় সব প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে। এমনকি 'গরিবের ডাক্তার' নামে খ্যাত বরিশালের ড. মনীষা চক্রবর্তী ভোট পেয়েছেন মাত্র ২২ হাজার।

পরাজয়ের পরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির আমির শফিকুর রহমান কারচুরি করে প্রার্থী নির্বাচন করা, বিভিন্ন জায়গায় রেজাল্ট শিটের ওপর ঘষামাজা করা এমনকি কিছু কিছু আসনে দ্বৈত নীতি অবলম্বন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন। কিছু আসন টার্গেট করে প্রশাসনকে ব্যবহার করে ফলাফল পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক আসনে নিজেদের বিজয় দাবি করে দেশব্যাপী দোয়া কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। তবে কোনো আনন্দ মিছিল বা সভা করা হয়নি।

আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবি নিজের ভেরিফায়েড এক্স একাউন্টে একটি পোস্টে বিএনপি ও দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিএনপি জয়লাভ করায় তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ব্রিটিশ হাইকমিশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি পরে ফোন করেও কথা বলেছেন। সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে চীন। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে 'তারেকভাই' সম্বোধন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার সংসদ সদস্যদের এই শপথ পাঠ করান। সংবিধানে বলা হয়েছে, গেজেট প্রকাশের পর স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার অথবা রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তি নির্বাচিতদের শপথ পাঠ করাবেন। তবে তারা শপথ পাঠ করাতে অসমর্থ হলে গেজেট প্রকাশের তিনদিন পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পাঠ করাবেন। কিন্তু দ্বাদশ সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী কোথায় আছেন, পরিষ্কার নয়। ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু কারাগারে রয়েছেন। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প আছে; এক, রাষ্ট্রপতির মনোনীত প্রতিনিধিকে দিয়ে নির্বাচিত সাংসদদের শপথ পড়ানো অথবা দুই, গেজেট প্রকাশের তিন দিন পর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে শপথ পাঠ। প্রথম পদ্ধতি অবলম্বন করে শপথ নিলে ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে বিএনপি নেতাদের মধ্যে। (তবে এ লেখা প্রকাশিত হওয়ার আগেই হয়তো সাংবিধানিক জটিলতা কাটিয়ে শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হবে)।

গণভোট কেন, কেমন হল ফল

আগেই জেনেছি গণভোটে 'হ্যাঁ' জিতেছে অর্ধেকের কিছু বেশি ভোটে। অর্থাৎ দেশের একটা বড় অংশের ভোটার 'না' ভোট দিয়েছেন। গণভোটে 'হ্যাঁ' জেতার অর্থ হল নতুন নির্বাচিত সরকারকে 'জুলাই সনদ'-এর শর্তগুলো মেনে কাজ করতে হবে।

তবে এই গণভোটের কোনও আইনি ভিত্তি নেই। একটা অনির্বাচিত সরকারের তৈরি করা শর্ত মেনে নতুন নির্বাচিত সরকার দেশ চালাতে রাজি নাও হতে পারে। কারণ তথাকথিত 'জুলাই সনদ' হল একটা অনির্বাচিত সরকারের তৈরি করা বয়ান বা বিধি। বিপুল ভোটে নির্বাচিত সরকারের সেটা মানার কোনও দায় নাই। নতুন সরকার যদি 'জুলাই সনদ' একবার মেনে নেয় তাহলে তথাকথিত 'জুলাই যোদ্ধা'দের তৈরি করে দেওয়া নীতি মেনে সরকার চালাতে হবে। এবং সরকারকে প্রথমেই মেনে নিতে হবে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়নি, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ২০২৪-এর জুলাইয়ে। একবার তা মেনে নিলে 'জুলাই চেতনা' সংসদে এবং সংসদের বাইরে নতুন করকারের গলার কাঁটা হয়ে দেখা দেবে। ইউনুস সরকারের তড়িঘড়ি গণভোট করার এটাই ছিল উদ্দেশ্য। কি ছিল গণভোটের সেই চার দফা ?

১. নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।

২. আগামী জাতীয় সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

৩. সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই সনদে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকবে।

৪. জুলাই সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

মহম্মদ ইউনুসের অনির্বাচিত সরকার (কার্যত একটা এনজিও সরকার) শুরু থেকেই জামায়াত এবং গোড়া ইসলামপন্থীদের মদত দিয়েছে। মনে হয়েছে, ইউনুসের সরকার যেন জামায়াতই চালায়। যাঁরা বাংলাদেশের তথাকথিত জুলাই বিপ্লবের গতিবিধি গোড়া থেকে অনুসরণ করেছেন, তাঁদের স্মরণে থাকবে, ৫ জুলাইয়ের পরে সেনাপ্রধান ওয়াকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তুতিতে কাদের ডাকা হচ্ছে জানতে চাওয়া হলে সাংবাদিকদের একটাই নাম বলেছিলেন। সেটা হল জামায়াতে ইসলামের আমির বা প্রধান সফিকুর রহমান। অনেক পরে অনেক ভেবে অন্যান্য দলেক নাম করেন। যেন আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে ছিল।

গণভোটের দুই নম্বর শর্তে বলা হয়েছে জাতীয় সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। জামায়াতে ইসলামি যেহেতু প্রায় প্রায় ৫০টি আসলে খুব কম ব্যবধানে হেরেছে, তাই প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হিসেবে সংসদের উচ্চ কক্ষে তারা অন্তত ৪০টি আসনের দাবিদার হতে পারবে বলেই মনে করছেন অনেকে। তা যদি হয় তাহলে বিএনপি-র পক্ষে কোনও আইন পাশ করানোটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। তবে 'জুলাই সনদ' নতুন সরকার মানবে কিনা তার ওপরেই সব নির্ভর করছে।

এছাড়া জুলাই সনদে সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূল নীতি বদলে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূল নীতি হলঞ্জ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা'। জুলাই সনদে সেটা বাতিল করে বলা হয়েছে, 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি'। এটা দীর্ঘ ব্যাখ্যা দাবি করে। তবে বোঝাই যাচ্ছে, কাদের সুবিধা করে দেওয়ার জঞ্চন্য 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা'-র মতো বহু কষ্টে অর্জিত সংবিধানের চার মূল নীতি বদলে ফেলতে চেয়েছে ইউনুসের সরকার। জুলাই সনদ মেনে নিলে নতুন সরকারকে, বলাইবাহুল্য এটাও মেনে নিতে হবে।

কেন এই বিপুল জয় বিএনপির

অনেকে মনে করছেন, গত দেড় বছর ধরে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, দেশের স্বাধীনতাকে নিচু করে মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়েছে তা সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কার বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের চেতনায় রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ বা তার যোদ্ধা এবং নেতাদের ছোট করা হলে, তাদের অপমাণ করা হলে বাংলাদেশের মানুষ মেনে নিতে পারে না। গত দেড় বছরে তাদের দেখতে হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান, দেশের স্বাধীনতার মহানায়ক মুজিবর রহমানকে নাকচ করার চেষ্টা, ৩২ নম্বর বাড়ি বারবার ভেঙে ফেলা গুঁড়িয়ে দেওয়া। সেটা মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না সাধারণ মানুষের। তারা অপেক্ষা করেছে একটা ভোটের। তারা ভেবেছে একটা ভোট এলে ব্যালটে তার জবাব দেওয়া যাবে। তারা চেষ্টা করেছে অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক একটা দলকে বেছে নিতে। তাছাড়া বিএনপি দলে এখনও বহু মুক্তিযোদ্ধা আছেন।

সংখ্যালঘু ভোট তথা হিন্দু ভোটের সবটুকুই গেছে বিএনপি-র দিকে। গত দেড় বছরে হিন্দুদের মন্দির ভাঙা, হিন্দু যুবক ও

ব্যবসায়ীদের খুন করা, এক সন্নাসীকে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা ছাড়া অসংখ্য সংখ্যালঘু বাড়িঘরে আগুন দেওয়া এবং লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। সরকার প্রায় কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামেও উপজাতীয়দের খুন বাড়িঘরে লুটপাট ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তার বিচার হয়নি। ফলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সেই হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ উগরে দিয়েছেন ভোটের বাক্সে। আগামী দিনে সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের পক্ষে কথা বলার মতো কোন এমপি এবার জাতীয় সংসদে আছেন কিনা, এমন প্রশ্নে দু'জনের নাম অবশ্যই করা যায়; এডভোকেট ফজলুর রহমান এবং ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এমপি। সংখ্যালঘু হিন্দুরা মনে করে, যেকোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সহ সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের পাশে তাঁরা থাকবেন। ফজলুর রহমান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও বটে।

নারীদের ক্ষেত্রেও খানিকটা সেই রকমই ঘটেছে। জামায়াত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা পেলে ইসলামি শরিয়া আইন জারি করবে এবং সেখানে নারীর কি অবস্থা হবে তা আফগানিস্তান ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া জামায়াত নেতারা ক্রমাগত নারী বিরোধী বয়ান নির্মাণ করে তা প্রকাশ্যে প্রচার করে দেশের মহিলাদের ভীত করেছেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যলয়ের মেয়েদের প্রকাশ্যেই বলেছেন 'বেশ্যা'। তাঁরা ইসলামি বিধি মেনে মেয়েদের বাইরে কাজ না-করার এবং কেবলমাত্র গর্ভধারণ করার পক্ষে বারবার ঘোষণা করেছেন। ফলে মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ 'অপেক্ষাকৃত নিরাপদ' বিএনপিকেই ভোট দিয়েছেন।

গত দেড় বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অবারজকতা সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলেও যে জামায়াত নিয়ন্ত্রিত 'ছাত্র-জনতা'ই কাজ করেছে তাতে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষকদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া, তাঁদের মারধার করা; সবই চলেছে দিনের পর দিন। বহু শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যলয়ের উপাচার্যরাও ছাড় পাননি। সেই সব শিক্ষক আর অভিভাবদের মতামতেরও প্রতিফলন ঘটেছে এই ভোটে।

গণ-উশৃঙ্খলার এসবই ঘটেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ মানুষকে জড়ো করে তাদের তাতিয়ে দিয়ে। যাকে বাংলাদেশে বগ্ধলা হচ্ছে 'মব'। 'মব সহিংসতা' কথাটা বাংলাদেশ খুব চালু এখন। গত দেড় বছরে এই মব ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল। মব জড়ো করে কারখানায় আগুন, যে কাউকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা; এটা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশর প্রধানমন্ত্রীর বাসভাবন 'গণভবন' এবং সংসদ ভবনে ঢুকে অবাধ লুটপাট এবং ভাঙচুরের ঘটনার পরে। সেটা আটকানোর কোনও চেষ্টা তো হয়ইনি, বরং সংবাদপত্রে ওই ঘটনাকে পরোক্ষে আস্কারাই দেওয়া হয়। গণভবনের লুটপাটের ছবি তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ মব-আতঙ্কে দিন কাটিয়েছে এই নির্বাচনের অপেক্ষায়। তাছাড়া ওই অরাজকতার সময় পুলিশের যে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র গোলাবারুদ লুট হয়েছিল তার সামান্যই সরকার ফেরত পেয়েছে। সবই ওই উশৃঙ্খল ছাত্র-জনতার হাতে রয়ে গেছে। অতঙ্কিত সাধারণ মানুষ ব্যালটে তার প্রতিবাদ করেছে।

এছাড়া শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থা মোটেই সুবিধাজমক জায়গায় নেই। সেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছি গিয়েছিল। গত দেড়বছরে ইউনুসের নেতৃত্বধীন সরকার দেশের শিল্প বাণিজ্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেই সাফল্যকে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার যেখানে ১৮.৭ শতাংশ ছিল, সেটি এখন বেড়ে ২১ শতাংশের ওপর চলে গেছে। দেশে দারিদ্র্যের হার বেড়ে এখন ২৭.৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গিয়ে দারিদ্র্যের হার বেড়ে গেছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। বেসরকারি বিনিয়োগ সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন। বিদেশি বিনিয়োগও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। দেশে খাদ্যপণ্যের দাম কমছে না। তথ্য বলছে, চালের চাহিদার চেয়ে দেশে উৎপাদন বেশি রয়েছে। তারপরেও বিশ্বে চালের দাম কমলেও বাংলাদেশে কমেনি। সাধারণ মানুষের সেই কষ্টের প্রতিফলন দেখা গেছে নির্বাচনের ফলাফলে।

ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বেহাল দশায় রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশিদের ভিসা পাওয়ার হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। প্রায় কোনও দেশই বাংলাদেশের অনির্বাচিত সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। একদিকে অভ্যন্তরীণ নীতির কারণে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলো ভিসা দেওয়ার হার যেমন কমিয়েছে, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশের শ্রমবাজারও বাংলাদেশিদের জন্য কার্যত বন্ধ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুরে শ্রমশক্তি ও ছাত্র ভিসায় কিছু মানুষ যেতে পারলেও সংখ্যা খুবই নগণ্য। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, এবং সিঙ্গাপুরের ভিসা কিছুটা নাগালের মধ্যে থাকলেও বাংলাদেশের জন্য সেটাও সুবিধাজনক নেই। এছাড়া দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়ার হার কমিয়েছে পার্শর্বর্তী দেশ

ভারতও। ব্র্যাক মাইগ্রেশন সেন্টারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে প্রায় এক লাখ বাংলাদেশিকে নানা কারণে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এই অবস্থায় দেশের মানুষ বাধ্য হয়েছে বেছে নিয়েছে এমন একটা দলকে যারা হয়তো এই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারবে।

সাধারণ মানুষ দেড় বছর অপেক্ষা করেছে ভোটের জন্য; ব্যালটের মাধ্যমে সব অন্যায়ের জবাব দেওয়ার জন্য। এমন নয় যে বিএনপি এলে বাংলাদেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্টা হবে। তবু তো কিছু দিনের জন্য হলেও ইউনুস সরকারের আমলের গণ-হিংসা উশৃঙ্খল জনতার রাজত্ব; যাকে সে বাংলাদেশে 'মব' বা 'মব সহিংসতা' বলা হচ্ছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। যদিও আমরা এতদিনে জেনে গেছি আওয়ামি লিগ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পরে বাংলাদেশে তোলাবাজির যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে নেয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। অবশ্য এই অভিযোগে ভোটের আগে প্রায় পাঁচ হাজার নেতা কর্মীকে বিএনপি দল থেকে বহিস্কার করেছে।

৩০০ আসনের বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এ বার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে যাচ্ছেন মাত্র চার জন। সংখ্যাটা অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় রেকর্ড পরিমাণ কম। আওয়ামি লিগ জমানায় সংসদে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব থাকতো পনেরো থেকে কুড়ির কোটায়। বিজয়ী এই চারজনই নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি-র টিকিটে। অন্তত ৭৯ জন ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নিবন্ধিত ৬০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২২টি দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে ৬৭ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এর বাইরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ১২ জন প্রার্থী নির্বাচনে লড়েছেন।

জামায়াতের উত্থান

আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে এবং গত দেড় বছরে কার্যত ইসলামপন্থীদের সহায়তায় মহম্মদ ইউনুস সরকার চালানোয় জামায়াতের ইসলামী পায়ের নিচের মাটি অনেকটাই শক্ত করে নেয়। নির্বাচনে তার প্রতিফলন দেখা গেল। দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন জোট-নির্ভর দল হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি এবার সংসদ নির্বাচনে নিজস্ব শক্তির প্রদর্শন করেছে। তারা এককভাবে ৬৮টি আসনে জয় পেয়েছে, যা তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ। জোটগত হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭। ফলে সরকার গঠনের পর্যায়ে না পৌঁছালেও বিরোধী দলের আসনে বসবে জামায়াত। ৬৮টি আসনে জামায়াতের একক জয় দলটির জন্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ১৯৯৬ সালে এককভাবে নির্বাচন করে পেয়েছিল ৩টি আসন। ১৯৯১ সালে ১৮টি, ২০০১ সালে ১৭টি ও ২০০৮ সালে ২টি আসনে জয় পেয়েছিল জামায়াত। সেই তুলনায় এবারের ফল দলটির জন্য ঐতিহাসিক মোড়। ১৭ বছর পর জামায়াত নিজস্ব নেতৃত্বে জোট গড়ে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। দেশের উত্তরাঞ্চল; রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল; খুলনা বিভাগ জামায়াতের সাফল্যের প্রধান ক্ষেত্র। খুলনা বিভাগের ৩৬টি আসনের মধ্যে ২৫টিতে, রংপুরের ৩৩টির মধ্যে ১৬টি এবং রাজশাহীর ৩৯টির মধ্যে ১১টি আসনে জয় পেয়েছে।

এবারের নির্বাচনে তরুণ এবং নারী ভোটারদেরও একটি অংশ জামায়াতের দিকে ঝুঁকেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাফল্যকেও কেউ কেউ এর কারণ হিসেবে দেখছেন। তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী তরুণদের দল 'এনসিপি'র সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য বা জোটও একটি নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে।

তবে জামায়াতের এই উত্থান নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিশ্লেষণ প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, দীর্ঘ ১৫ বছর ফ্যাসিস্ট শাসন ছিল। যখনই গণতন্ত্র চাপা থাকে, মানুষের কণ্ঠ রোধ করা হয়, তখন উগ্রবাদী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে; সেটাই এ দেশে ঘটেছে। জামায়াতের যেটুকু উত্থান হয়েছে, তা আওয়ামী লীগের কারণেই হয়েছে। তাদের দমন-পীড়নমূলক শাসন, বিরোধী দলকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না দেওয়া, নির্বাচন করতে না দেওয়ার কারণে এটা হয়েছে।

এবং অবশেষে

বাংলাদেশের এক তরুণীর ফেসবুকের পাতায় দেখা গেল ভোট পরবর্তী এক প্রত্যয়ী উচ্চারণ। এ উচ্চারণে আজ সে দেশের লাখো মানুষের কণ্ঠস্বর মিশে গেছে। সেই লেখার একটা প্রসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া গেলঞ্জ আমাদের এই দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়া, যেখানে রাজাকারের মতো দেশবিরোধীদের কোন স্থান নেই। নির্বাচনে তাদের পরাজয় প্রমাণ করে যে, ঘৃণা আর বিভাজনের রাজনীতি এদেশের মাটিতে টেকেনি এবং টিকবে না। আমরা এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচবে। যারা একাত্তরের চেতনার বিরোধিতা করে তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা আজীবন অটুট থাকবে। এই জয় কেবল ব্যালটের নয়, এই জয় আমাদের আদর্শের এবং চির উন্নত মম শিরের।'

বাংলাদেশের নির্বাচন—এখন যা করতে হবে

তসলিমা নাসরিন

এই নির্বাচনে আমি খুশি বিএনপি জিতেছে বলে নয়, রাজাকার-জিহাদি-সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পরাজিত হয়েছে বলে। তারা গত দেড় বছর বিকট দাপট দেখিয়েছে, লক্ষ সমর্থক নিয়ে সভা করেছে, দিনে রাতে যখন ইচ্ছে মব সন্ত্রাস করেছে, যাকে ইচ্ছে তাকে হত্যা করেছে, নির্যাতন করেছে, হিন্দু বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, হিন্দুদের পিটিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, একজন নারীকেও ভোটের জন্য প্রার্থী হতে দেয়নি, এমন চরম নারীবিদ্বেষী দল কর্মজীবী নারীদের বেশ্যা বলে গালি দিয়েছে, নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বলেছে, নারীকে বোরখা আর নিকাবের অন্ধকারে ছুড়ে দিয়েছে, নারীদের দেখেছে পুরুষের ক্রীতদাসি আর যৌনদাসি হিসেবে, নারীবিরোধী শরিয়া আইনের স্বপ্ন দেখা জামাতে ইসলামীকে জনগণ ক্ষমতায় যেতে দেয়নি। এটিই আপাতত সুখবর।

এখন বিএনপিকে কী করতে হবে বলে আমি মনে করি।

(১) জুলাই সনদ বাতিল করতে হবে। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আনতে হবে। রাষ্ট্রধর্মকে বিদেয় করতে হবে। (২) ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইন বাতিল করে নারীর সমানাধিকার রক্ষার জন্য সমানাধিকারের ভিত্তিতে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি জারি করতে হবে। (৩) বাকস্বাধীনতা, মানবাধিকার, সংখ্যালঘুদের (হিন্দু,বৌদ্ধ, খ্রিস্টান , আদিবাসী) নিরাপত্তা, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। (৪) মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করে সেক্যুলার বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। (৫) নিশ্চিত করতে হবে সবার জন্য শিক্ষা আর সবার জন্য স্বাস্থ্যপরিষেবা। (৬) গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে হবে। এবং তাদের নেতৃবৃন্দ যেন নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে রাজনীতি করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে একটি জিহাদি সমর্থিত জামাতে ইসলামিকে রাখা নিরাপদ নয়। (৭) অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি ধনী আর গরিবের মাঝখানের ফারাক কমাতে হবে। (৮) পরিবারভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে সরে আসতে হবে। (৯) শেখ হাসিনার শাসনামলে ব্লগার হত্যার কারণে মুক্তচিন্তকরা প্রাণ বাঁচাতে দেশের বাইরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা যেন দেশে ফিরতে পারেন এবং নিরাপদে তাঁদের কাজ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। (১০) বাকস্বাধীনতা, প্রেস ফ্রিডম ইত্যাদি লঙ্ঘন করা চলবে না। যে বই, থিয়েটার, সিনেমা এ যাবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সব যেন মুক্তি পায়। (১১) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য আবার গড়ে তুলতে হবে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িও আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। (১২) নারীদের হিজাব, বোরখা ইত্যাদি যেন কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলক না করে। বোরখা নিকাব সিকিউরিটির কারণেই যেন নিষিদ্ধ হয়। (১৩) যে জিহাদি সন্ত্রাসীদের জেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তাদের যেন ফের জেলে ঢোকানো হয়। (১৪) ভারতের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক বন্ধ করে, যেন মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করা হয় রাষ্ট্র এবং জনগণের স্বার্থে। (১৫) চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সমর্থক, শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক— যাঁদের কারাগারে অন্যায়ভাবে বন্দি করা হয়েছে, তাঁদের সবাইকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়।

অর্থনীতি

বাজেট থেকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি : সরকার শক্তের ভক্ত গরিবের শত্রু

অমিত দাশগুপ্ত

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় দু'দুটো ঘোষণা, থুড়ি এরাজ্যের ক্ষেত্রে তিনটি; মাস পয়লায় রবিবারে কেন্দ্রীয় বাজেট, ৫ তারিখে রাজ্য বাজেট, পরের দিন ট্রাম্পের নির্দেশ মেনে যুগান্তকারী (সত্যিই যুগান্তকারী, দেশের কৃষিকে বিদেশি অনাক্রমণের যুগের অন্ত) মার্কিন-ভারত বাণিজ্যচুক্তির ঘোষণা। এর পরেও অবশ্য সারা মাস জুড়ে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং অবশেষে মাসের শেষ দিনে নির্বাচক তালিকা ঘোষণা। তার উপরে শোনা যাচ্ছে, জ্ঞানেশবাবু ধমকেছেন যেন একজনও বিদেশির নাম নির্বাচক তালিকায় না থাকে (অর্থাৎ দেশি নাগরিকের নাম বাদ গেলে তা জায়েজ)। ফলে ব্যস্ততার কোনো শেষ নেই।

ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে; এই লেখার বিষয়বস্তু মোটেই দেশের নাগরিক-বেনাগরিক না নয়, অত্যন্ত নীরস বাজেট, বাণিজ্যচুক্তি। বাজেট নিয়ে কথা বলার সময় রাজ্য বাজেটের মত এলেবেলে জমা-খরচের হিসেবকে ব্রাত্য রাখাই ভালো। এই রাজ্যের বাজেটের ১২-১৩ গুণ খরচ হয় কেন্দ্রীয় বাজেটে। কেন্দ্রীয় বাজেটের পরিমাণ ৫০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি, এরাজ্যের ক্ষেত্রে তা ৪ লক্ষ

কোটি টাকার মত। রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপন্ন ২০ লক্ষ কোটি টাকার মত, দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপন্ন প্রায় ৩৬০ লক্ষ কোটি টাকা। যদিও রাজ্যের উৎপাদনসমূহ যোগ করেই কেন্দ্রের ওই জিডিপি পাওয়া যায়, তবুও কেন্দ্রের শাসকরা রাজ্যগুলিকে তাদের সাম্রাজ্যের তালুক হিসেবেই গণ্য করে থাকে। যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলা হয়েছে সংবিধানে তা কেবল বাক্য বিন্যাসেই রয়ে গিয়েছে। যে কর রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির উৎপাদন ও আয়করদাতাদের কাছ থেকে আদায় করবে তারপরিমাণ ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে ৪৪ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা, তার মধ্যে ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা (৩৪ু) রাজ্যগুলির কাছে করের ভাগ হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্যসমূহ এসজিএসটি পাবে সরাসরি ১০ লক্ষ ১৯ হাজার কোটি টাকা। ফলে কর রাজস্ব হিসেবে (পেট্রলের উপর বিক্রয় কর, মদের উপর আবগারি শুল্ক, সম্পত্তি কেনাবেচার উপরে স্ট্যাম্প ডিউটি, বা পরিবহণের উপর জরিমানা ব্যতিরেকে) কেন্দ্রের কাছে যাবে ২৮ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকা। ওদিকে সব রাজ্য মিলিয়ে পাবে ২৫ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। কথায় বলা হত, অর্ধেক ষষ্ঠী অর্ধেক গুরুগুষ্ঠি। তার থেকেও বেশি পক্ষপাতমূলক এই ভাগাভাগি। এটা সত্যি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ ৮.১৫ লক্ষ কোটি টাকা, জিএসডিপির ৩৮-৩৯ শতাংশ। সেই ঋণ যথেষ্টই বেশি, তার সুদ হিসেবে ২০২৬-২৭ সালে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৫৩ হাজার কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের প্রায় ১৪ শতাংশ। কেন্দ্রে ঋণের পরিমাণ ২১৫ লক্ষ কোটি টাকা, জিডিপির ৫৫-৫৬ শতাংশ। ঋণের উপরে সুদ দেওয়া হবে ১৪ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। তবুও রাজ্যের ভাঁড়ে মা ভবানী, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার টাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদিকে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এমন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার অভাবের কথা কখনো শোনা যায় না, যদিও দেশের লোক অভাবেই থাকে।

এরকম দরিদ্র রাজ্যের বাজেট নিয়ে আলোচনার বিশেষ কিছুই থাকে না, কেন না রাজ্যের হাতে না আছে জিএসটি বাড়ানোর কমানোর ক্ষমতা, না কর্পোরেট কর বাড়িয়ে আয় বাড়ানোর বা আয়কর কমিয়ে সাধারণ মানুষকে রিলিফ দেওয়ার শক্তি; ফলে সেই বাজেট নিয়ে কীই বা ভাবার আছে! কেন্দ্রীয় সরকারই তো একমাত্র পারে দেশকে বিশ্বগুরু করে অমৃতকালে নিয়ে যেতে। সেই লক্ষ্যে বাজেট, 'মাদার অফ অল ডিলস' ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি বা বন্ধু ট্রাম্পের হুমকিতে মাথা নুইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসায় চুক্তি। ট্রাম্পের সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুত্বের গল্প শুনে আলেকজান্দার ও পুরুর মধ্যে সেই তথাকথিত কথপোকথনের কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে আলেকজান্ডার বিজিত পুরুর কাছে জানতে চাইছেন, তিনি সম্রাটের কাছে কী আচরণ প্রত্যাশা করেন; পুরু উত্তরে বলছেন, রাজার কাছে রাজার মতন। যদিও অভিজ্ঞতা বলে যে বিজিত রাজার প্রতি জয়ী কেমন আচরণ করবে তা জয়ীই ঠিক করে। তেমনই বোধহয় সম্রাট ট্রাম্পের কাছে বারবার অপদস্থ মহারাজ মহান বাণিজ্যচুক্তি করছেন, 'সমতার' ভিত্তিতে। যে ভিত্তিতেই সেই চুক্তি করা হোক না কেন, কোনো রাজ্যের বক্তব্য তাতে শোনা হয়েছে এমনটা জানা নেই। যদিও সেই চুক্তির ফলে কোনো কোনো রাজ্য ও কোনো বৃহৎ শিল্পপতির লাভ হবে, কোনো রাজ্যের ক্ষতি হবে। এভাবেই চলছে দেশের 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' বন্দোবস্ত।

ট্রাম্প সাহেব মনে করেন যে, বিশ্বজোড়া ফাঁদ তিনি পেতেছেন, হয় সামরিক অথবা ট্যারিফ বা শুল্কের হুমকির, যে ফাঁদে সকলকেই তিনি বন্দী করবেন। ইতিপূর্বেই এখানে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে, মার্কিনি শুল্ক আরোপের হুমকির কাছে ভারত ক্রমশ অধিকাধিক অসহায় হয়ে পড়ছে। কারণ দ্বিদলীয় স্যাংসনিং রাশিয়া আইন, যা গ্রাহাম-ব্লুমেনথাল বিল লাগু হলে ভারত তথা ব্রাজিল এবং চিনের থেকে করা আমদানির উপরে ৫০০ শতাংশ শুল্ক বসাবে আমেরিকা, যদি না ওই দেশগুলি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করে। ব্রাজিল বা চিন সেই চাপের কাছে মাথা নত করেনি, ভারত করেছে। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যে বাণিজ্যচুক্তি হচ্ছে সে বিষয়ে হোয়াইট হাউস যে ফ্যাক্টশিট চালু করেছে তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেইজন্যই অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক প্রত্যাহারে ট্রাম্প সাহেব রাজি হয়েছেন (president Trump agreed to remove the additional 25% tariff on imports from India in recognition of Indiaós commitment to stop purchasing Russian Federation oil)। দ্বিতীয়ত, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পদ্ধতিগত ভারসাম্যহীনতাকে মোকাবিলা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাল মেলাতে ভারত আগ্রহ দেখানোর জন্যই আমেরিকা পারস্পরিক শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করবে (Given India' willingness to align with the United States to confront systemic imbalances in the bilateral trade relationship and shared national security challenges– the United States will lower the Reciprocal Tariff on India from 25% to 18%.)। অর্থাৎ, ভারত আমেরিকার তথা ট্রাম্প সাহেবের কাছে আবেদন করে, তাঁর শর্ত মেনে চুক্তি করেছে।

এটা সত্যি যে ট্রাম্প জমানার আমেরিকা প্রায় সকল দেশ থেকে আমদানির উপরে শুল্ক চাপিয়েছে। প্রথমে সেই হার অত্যধিক বাড়ানোর পরে তা কমিয়েছে। তবে সেই হ্রাস-বৃদ্ধি সমহারে ঘটেনি বা ওই হার হ্রাস করার সময়ে যে সমস্ত শর্ত চাপানো হয়েছে তা সব দেশের ক্ষেত্রে এক থাকেনি। উন্নত দেশগুলির সঙ্গে ট্রাম্পের শুল্ক চুক্তি ওই পূর্বে উল্লেখিত রাজার প্রতি রাজার ব্যবহারের মত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে তা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। অপরদিকে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারতের উপরে আরোপিত শুল্ক হার ১৮ থেকে ২০ শতাংশ। তাছাড়া শেষোক্ত দেশগুলি আমেরিকার থেকে আগত আমদানির অধিকাংশের উপরেই শুল্ক ছাড় দিচ্ছে বা কমাচ্ছে। কিন্তু ইউকে ব্যতিরেকে প্রথমোক্ত দেশগুলি আমেরিকা থেকে আমদানির উপরে রফতানিকৃত পণ্যের অনুরূপ শুল্ক চাপিয়েছে। চিন কিন্তু আমেরিকার চাপের কাছে মাথা নোয়ায়নি, আগে ট্রাম্প প্রভূত শুল্ক বসালেও পরে চিনও বিপুল শুল্ক বসায়; পরবর্তীতে সমঝোতার মাধ্যমে সেই শুল্ক উভয়পক্ষেই ৩০ শতাংশে এসে দাঁড়ায়।

ভারতের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই বাণিজ্যচুক্তি যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বা এই চুক্তি যে আমেরিকার পক্ষাবলম্বী তার সর্বোচ্চ উদাহরণ হল মার্কিন পণ্যের উপরে আমদানি শর্ত ও শুল্ক হারের বিপুল হ্রাস ও আমদানির পরিমাণের বিপুল বৃদ্ধির আগ্রহ। ট্রাম্প পূর্ববর্তী সময়ে ওই সকল পণ্যের উপরে ১২.৫ থেকে ১৫ শতাংশ শুল্ক ছিল। এখন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্যে রূপান্তরিত হবে। কেবল তাই নয়, যে কৃষি পণ্যের উপরে ১০০ শতাংশ অবধি কর ছিল, তার কয়েকটির ক্ষেত্রেও শুল্ক বিলোপ, অপর কয়েকটির ক্ষেত্রে শুল্কহ্রাস, আর খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকা, যেখানে পূর্ববর্তী সময়ে দুগ্ধজাত পণ্য, কৃষিপণ্যকে ঘোষিতভাবে এই রকমের চুক্তির বাইরে রাখা হত। দ্বিতীয়ত, মার্কিন ফ্যাক্টশিট অনুযায়ী ভারত আগামী ৫ বছরে ৫০,০০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করার আগ্রহ দেখিয়েছে। অর্থাৎ বছরে গড়ে ১০,০০০কোটি ডলার। ২০২৪-২৫ সালে মার্কিন পণ্যের ভারতের আমদানি ছিল ৪,৫০০ কোটি ডলার, রফতানি ছিল ৮,৫০০ কোটি ডলার। মার্কিন আমদানি শুল্কের জেরে রফতানি বাড়ার সুযোগ কমেছে, ওদিকে আমদানি যদি ১০,০০০ কোটি ডলার হয়, তাহলে ৪,০০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এক-দেড় হাজার কোটি ডলারের বাণিজ্য ঘাটতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া রাশিয়ার থেকে সস্তায় তেল আনা বন্ধ হওয়ার ফলে যে তেল আমদানি খরচ বাড়বে তা ১,০০০ কোটি ডলার ছাড়াতে পারে। ফলে এই বাণিজ্যচুক্তি ভারতের পক্ষে একদিকে অলাভজনক, অপরদিকে অসম্মানজনক। সেই চুক্তিকে নিয়েই বিজেপি উৎসব শুরু করেছে, মোদিজিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আমদানি শুল্ক দুই-আড়াই শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করেছিল (রাশিয়ার থেকে তেল আমদানির জন্য ২৫ শতাংশ ছাড়া) তা কমিয়ে ১৮ শতাংশ হয়েছে তাই ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। আদতে তা ২ থেকে বেড়ে ১৮ শতাংশ হয়েছে। আমাদের দিক থেকে শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে গড়ে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই চুক্তির ফ্যাক্টশিটে লেখা হয় যে আমেরিকা ভারতের বাণিজ্যের উপর নজরদারি করবে; বিশ্বগুরু ও তার পার্ষদরা এত অসম্মানের পরেও একটি কথাও বলেন না। যেহেতু অন্যান্য এশিয় দেশগুলির (জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া বাদে) পণ্যের উপরে শুল্ক ১৯-২০ শতাংশ তাই শাসক দল খুব উত্তেজিত। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তিতে সেখানকার সুতিবস্ত্রের উপরে শুল্ক উঠিয়ে দেওয়ার কথা হয়েছে যদি সেই বস্ত্র আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্য দ্বারা প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশ তুলো আমদানি করে থাকে তাই এতে তাদের কোনো অসুবিধের কথা নেই। তারা বস্ত্র রফতানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধে পাবে।

যদি ট্রাম্পের চাপের কাছে পুরোপুরি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে কৃষিপণ্যের বাজার হাট করে খুলে দেওয়া হয় তাহলে দেশের কৃষকদের কাছে তা দুর্দিনে রূপান্তরিত হবে, অবশ্য কর্পোরেট পুঁজির কাছে তা স্বল্প মূল্যে কৃষিজাত উপকরণের সুযোগ তৈরি করবে। তাই পুঁজির উপরে নির্ভরশীল এই শাসনতন্ত্র তেমনটা করতে নারাজ হবে তা বলা যায় না, যদি তা তাদের নির্বাচনী কোন অসুবিধে না করে। সাম্প্রতিক বাজেটগুলি সরকারের এই কর্পোরেট তোষণকেই উন্মুক্ত করে।

দেশের প্রধান সমস্যাগুলো হলো আকাশচুম্বী অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং ব্যাপক বেকারত্ব। এর একমাত্র সমাধান ছিল ধনীদের ওপর কর বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়া, যাতে বাজারে চাহিদা বাড়ে এবং কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কিন্তু সরকার ধনীদের ওপর কর না বাড়িয়ে বরং পরোক্ষভাবে কমানোর চেষ্টা করছে এবং রাজকোষ ঘাটতি কমানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। অপরদিকে কোঅপারেটিভ ফেডারালিজমের নামে কেন্দ্র একতরফাভাবে রাজ্যগুলোর ওপর আর্থিক বোঝা চাপাচ্ছে। করের বদলে 'সেস' বা সারচার্জের মাধ্যমে কেন্দ্র নিজের কাছে সম্পদ কুক্ষিগত করছে এবং রাজ্যগুলোকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। বাজেট কর্মসংস্থান বা দারিদ্র্য দূরীকরণের পরিবর্তে কর্পোরেট তোষণ

এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আস্ফালনকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বাজেটে মোট জমার ২১ শতাংশ আসবে ব্যক্তিগত আয়কর থেকে, ১৮ শতাংশ আসবে কর্পোরেট কর থেকে; অর্থাৎ মোট অনুমিত আয় করের ৫৪ শতাংশ ব্যক্তি আয়কর দাতা দেবে, যাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ নিছক মধ্যবিত্ত, অপরদিকে ৪৬ শতাংশ দেবে কোম্পানিগুলি। ২০০০-০১ সালে এই অনুপাত প্রায় বিপরীত ছিল (৫৩:৪৭)। ব্যক্তি আয়করদাতাদের কোনো সুরাহা মেলেনি যদিও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে আয়করের স্তর বিন্যাসে সামঞ্জস্য আনা জরুরি ছিল।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে এক অনীহাই দেখা যাচ্ছে। কৃষিতে ২০২৪-২৫ সালে খরচা হয়েছিল ১.৩০ লক্ষ কোটি টাকা, ২০২৬-২৭এর বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৬৫৪ কোটি টাকা বেশি। দু'বছরে এই বৃদ্ধি আদতে কৃষিতে খরচ হ্রাস, কারণ টাকার দাম কমেছে। ২০২৪-২৫ এর ব্যয়ের তুলনায় পিএমকিষানের, শস্যবীমার বরাদ্দ কমেছে। কৃষি গবেষণাতে ৯,৮১১ কোটি থেকে মাত্র ১৫৬ কোটি টাকা বেড়েছে। এটিও প্রকৃত অর্থে টাকার দামের হ্রাসকে গণ্য করলে কমেছে। বহু ক্ষেত্রেই এরূপ প্রকৃত বরাদ্দ কমানো হয়েছে। অপরদিকে ২০২৫-২৬ সালের বাজেট বরাদ্দ খরচের ক্ষেত্রে বহু মন্ত্রকের ঢিলেমি রয়েছে অথবা, বাজেটে অনুমোদিত হলেও আদতে তা বরাদ্দ করা হয়নি। যেমন জল-জীবন মিশনের জন্য বরাদ্দ ৬৭,০০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ১৭,০০০ কোটি টাকা; প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৫৫,০০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩২,৫০০ কোটি টাকা খরচ দেখানো হয়েছে ২০২৫-২৬এর সংশোধিত বাজেটে।

শক্তিশালীর কাছে আত্মসমর্পণ করাটাই শাসক দলের দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বরাদ্দ কম, বরাদ্দের তুলনায় খরচ আরো কম; ধনী কর্পোরেটের জন্য করে হ্রাস, রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা, দেশের ব্যবসায়িক গোষ্ঠিতন্ত্রের কাছে মাথা নোয়ানো; ট্রাম্পের ধমকের কাছে নতজানু হয়ে দেশের কৃষি ক্ষেত্রকে মার্কিন পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করা; উভয়তই শাসক বিজেপি ও 'বিশ্বগুরু' মোদিজি 'শক্তের ভক্ত গরিবের শত্রু'। দেখার কথা ধর্মের উন্মাদনা থেকে মুক্ত হয়ে কবে ভারতের সমস্ত ধরণের সাধারণ মানুষ এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারে!

(লেখক অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক)

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতের পক্ষে কি আদৌ লাভজনক ?

সৌর বসু

ভারত এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে সম্প্রতি একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই চুক্তির ফলে ভারতের বিশাল বাজারটি ২৭ টি দেশের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং বিনিময়ে ইউরোপ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পণ্য ভারতে আমদানি করা সহজ হয়ে যাবে। ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উড়সুলা ভন ডের লেইন এই চুক্তি সম্বন্ধে উল্লাসিত হয়ে বলেছেন ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যে এক ইতিহাস রচিত হলো। কুড়ি লক্ষ মানুষের জন্য একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি হলো যার ফলে উভয় পক্ষই লাভবান হবে। তিনি এই চুক্তিকে সকল চুক্তির জননী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য অলোচনা শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে। কিন্তু বিভিন্ন পণ্যের প্রবেশের অধিকার নিয়ে বিরোধিতার কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। ২০২২ সালে পুনরায় বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। তবে এই আলোচনা গতি লাভ করে দ্বিতীয় দফায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর। ২০২৫ সালে ক্ষমতায় এসে ডোনাল্ড ট্রাম্প অপ্রত্যাশিতভাবে এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন পণ্যের উপরে শুল্ক বৃদ্ধি করতে শুরু করেন। ভারতের উপর ইজ ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে এবং পরবর্তীকালে রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগে আরো ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের উপর অকারনে হুমকি জারি করেছেন। সম্প্রতি তিনি ডেনমার্ক থেকে গ্রিনল্যান্ড ছিনিয়ে নেবার হুমকি প্রদর্শন করেন। যে সমস্ত দেশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করেছে, তাদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করার হুমকি জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ছটি দেশকে এই হুমকির মুখোমুখি হতে হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে যে এই চুক্তি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরের কাজ এ বছরের শেষের দিকে হবে। এবং আগামী বছরের প্রথম দিকে এই চুক্তিটি কার্যকর হতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তিভুক্ত দেশগুলি বিশ্ববাজারের প্রায় ২৭ ট্রিলিয়ন ডলার এবং মোট দেশজ্ উৎপাদনের ২৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২৩ সালে

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের উপর থেকে সাধারণ পছন্দের কিছু সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়। তার ফলে ভারতের রপ্তানিকারকদের উচ্চ হারের শুল্কের মুখোমুখি হতে হয়। এই চুক্তির ফলে সেই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হতে পারে। এই নতুন বাণিজ্য চুক্তি ভারতের পক্ষে কতটা সুবিধা জনক হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে গেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। প্রথমত বিশ্বের কুড়ি শতাংশ জেনেরিক ওষুধের চাহিদা মেটায় আমাদের দেশের ওষুধ শিল্প। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের ওষুধ কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত এই চুক্তিতে কিছু শর্ত আরোপ করেছে, যার ফলে ভারতের সস্তায় ওষুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। কারণ এই শর্ত আরোপের ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলি উৎপাদিত সস্তা জেনেরিক ওষুধ গুলি বাজারে আসতে অতিরিক্ত সময় লাগবে। সে ক্ষেত্রে বাজারে জোগানেরর সমস্যা হেতু চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এর অভিঘাত এসে পড়বে গরিব মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর। এছাড়াও চুক্তির একটি ধারা অনুসারে ভারতের উৎপাদিত জেনারিক ওষুধ যদি ইউরোপের কোন বন্দরের উপর দিয়ে যায় সে ক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষর হাতে ওষুধগুলি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা থাকবে। মোটকথা ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরোপিত শর্তগুলি মেনে নিলে ভারতের জেনেরিক ওষুধ শিল্প বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্বন নিঃসরণ সংক্রান্ত যে নীতি রয়েছে তার প্রয়োগের ফলে ভারতের ইস্পাত, সিমেন্ট , অ্যালুমিনিয়াম শিল্পর উপর আঘাত নেমে আসতে পারে। কারণ ভারত যে পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন করে তাতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বেশি। এই বছর থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্বন বর্ডার এডজাস্টমেন্ট মেকানিজম সম্পর্কিত নীতি কার্যকর করেছে। তার ফলে ভারতের অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত সিমেন্ট বিদ্যুৎ প্রভৃতি শিল্পের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বা সবুজ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। চীন রাশিয়া ভারত প্রভৃতি দেশগুলি এই বৈষম্য মূলক করের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারতের ইস্পাত শিল্পের ৮০ শতাংশ এখনো কয়লার উপর নির্ভরশীল। কয়লা ভিত্তিক ব্লাস্ট ফার্নেস প্রযুক্তি ভারতে এখনো ব্যবহার করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প গুলি ব্যায় বহুল হয়ে পড়ার দরুন প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। উপরন্তু ছোট ছোট ইস্পাত কারখানাগুলি প্রযুক্তির উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করতে না পেরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অটোমোবাইল শিল্পের ক্ষেত্রেও ইউরোপের গাড়িগুলোর উপর থেকে শুল্ক ৭০ শতাংশ কমিয়ে ৪০ শতাংশ করার কারণে বিদেশি বিলাসবহুল গাড়ি ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করবে। এর ফলে ভারতে যে সমস্ত মোটর গাড়ি তৈরি হচ্ছে, তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পারার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অটোমোবাইল শিল্প মন্দার কবলে পড়তে পারে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই প্রস্তাবিত চুক্তির জন্য বিশেষজ্ঞদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কারণ ইউরোপের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প অত্যন্ত আধুনিক এবং পুঁজি নির্ভর। এদের মান অনেক উন্নত। এই উন্নত পুঁজি নির্ভরশিল্পের সঙ্গে ভারতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প যুঝে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। ইউরোপিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বাজার দখল করে নেবে। ভারতীয় বৃহৎ শিল্প তাদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে পাল্লা দিতে পারলেও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র যে শিল্প আছে তারা প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে, বিলুপ্তির পথে চলে যেতে পারে। কৃষি এবং দুগ্ধ শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলি ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। তার ফলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম কম থাকে। সেই কারণে ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরন শিল্প অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তার অভিঘাত এসে পড়বে ভারতীয় কৃষকদের উপর।

বস্তুতপক্ষে ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি অসম চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিটিকে কোন মতেই ফ্রি ট্রেড প্যাক্ট বলা যায় না বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন। সম্প্রতি অর্ণব গোস্বামী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক Jeffrey Sachs কে একটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের সম্পর্কের বিষয়ে প্রশ্ন করলে Prof Sachs বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে ভারত বিপদে পড়বে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বস্তুত পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করতে চায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থা কে পরাভূত করতে চেয়েছে। অপর দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে চেয়েছে।

ভিয়েতনাম কিউবা ইরাক সিরিয়া লিবিয়া প্রভৃতি দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে নির্মূল করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনিজুয়েলা কে দখল করতে চাইছেন, মেক্সিকো, কানাডা, ইরান গ্রিনল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোকে ভীতি প্রদর্শন করছেন।

তিনি নিজেকে পৃথিবীর অধীশ্বর বলে মনে করেন। অর্ণব গোস্বামীর একটি প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক (থত্বন্ত বলেন ভারতের কোয়াডের (আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া জাপান এবং ভারত সদস্য) সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে, BRICKS এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা পৃথিবী জুড়ে শান্তি স্থাপনের অন্যতম শর্ত। ভারতের এবার ব্রিকসের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি কে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ এসেছে। ভারতের উচিত সে ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

ভারত মার্কিন বানিজ্য চুক্তি—ট্রাম্পের চোখ রাঙানির কাছে মোদীর অসহায় আত্মসমর্পণ ও দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন

অমিতাভ সিংহ

সংসদে বিরোধী নেতা ভারত মার্কিন অন্তবর্তীকালীন বানিজ্য চুক্তিটিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করার কয়েক ঘন্টার মধ্য আমেরিকা ফ্যাক্ট শিটে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আনতে বাধ্য হল। রাহুল গান্ধী সংসদে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন একদিকে এপস্টিন ফাইল,অন্যদিকে আমেরিকায় ঘুষের মামলায় মোদী-মিত্র গৌতম আদানীকে সমনের চাপ।এই জোড়া চাপের মুখে ভারতমাতাকে বেচে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শর্ত মেনে মোদী বাণিজ্য চুক্তি করেছেন। আসলে চুপিচুপি ও হঠাৎ করে তড়িঘড়ি এই চুক্তি যা নিয়ে সংসদ তো দূরের কথা কোন জায়গায় কোনও আলোচনা ছাড়া এই চুক্তি হয়ে যাওয়ায় একটা সন্দেহের বাতাবরণ তো ছিলই।ভারত সরকার তা খোলসা না করলেও আমেরিকা স্পষ্ট করে চুক্তির শর্ত ও পণ্যের তালিকা প্রকাশ করে দেওয়াটাই মোদীর মুখে ঝামা ঘষে সত্যটাকে জনসমক্ষে নিয়ে আসে, যা মোদীর পক্ষে প্রবল অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে বিবৃতিতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল ডাল,সয়াবিন, বাদাম জাতীয় কৃষিপণ্য, কয়লা,ডিজিটাল সার্ভিস ট্যাক্সে আমেরিকা পেতে চলেছে বিপুল ছাড়। মনে রাখতে হবে ভারত ডালের বৃহৎ উৎপাদক এবং সর্ববৃহৎ উপভোক্তাও বটে। সুতরাং অন্য দেশ থেকে ডাল কিনতে আমরা যাব কেন ? চুক্তিতে বলা হয়েছে ভারত শিল্প সামগ্রী,বহু ধরণের খাদ্যপণ্য,কৃষিপণ্য ইত্যাদির ওপর শুল্ক শূণ্য বা অত্যন্ত কম শুল্ক চাপাবে যাতে আমেরিকার উপরিউক্ত পণ্যগুলি অবাধে ভারতের বাজারে ঢুকে ভারতের চাষীদের পণ্যকে পেছনে ফেলে একচেটিয়া বাজার করতে পারে।এছাড়া কতগুলি পণ্য কিনতে ভারত বাধ্য (কমিটেড) থাকবে যেমন জ্বালানি,তথ্য প্রযুক্তি, কয়লা, কৃষিজাত দ্রব্য প্রধান।যদিও পরের ফ্যাক্ট শিটে সম্ভবত রাহুলের তীব্র বিরোধীতার জন্যেই ‘ডাল’ ও ‘ কমিটেড ‘ শব্দদুটি অনুপস্থিত। কমিটেডের বদলে ইনটেন্ড শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ডিজিটাল সার্ভিস শুল্ক ভারত সম্পূর্ণ তুলে নেবে যা দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে পথে বসিয়ে দেবে।

স্বভাবতই কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলি মোদী সরকারকে চেপে ধরেছে ও বলেছে যে ভারতের কৃষি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আমেরিকার ইচ্ছেমত চুক্তি করা হয়েছে।এতে দেশের বিশাল ক্ষতি হবে,কৃষকেরা পথে বসবে ও আমেরিকা চুক্তির সব সুফল একাই ভোগ করবে।ভারতের হাতে পড়ে থাকবে চুষিকাঠি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন ‘সরকার ট্রাম্পের হুমকির কাছে এতটাই আত্মসমর্পণ করেছে যে পশুখাদ্য পর্যন্ত আমেরিকার কাছ থেকে কিনতে বাধ্য থাকবে ভারত। আমাদের প্রাণিসম্পদ ও পপশুখাদ্যের কোন অভাব নেই,তাহলে কেন আমরা তা আমেরিকার কাছ থেকে কিনব ? সরকার বার বার দাবী করেছে যে তারা চিরাচরিত জ্বালানি ছেড়ে বিশুদ্ধ জ্বালানির ব্যবহার করবে। কোথায় গেল কয়লার ওপর আত্মনির্ভরতা ? কয়লাও আমেরিকা থেকে আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে? মোদীর বহুচর্চিত স্লোগান সর্বস্ব বাক্যবন্ধ ‘আত্মনির্ভর ভারত’, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘ স্কিল ইন্ডিয়া’ বা ‘স্মার্ট সিটি’ এর ফানুস এত তাড়াতাড়ি চুপসে গেল ?

আমেরিকা বলেছে ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের বাজারে অবাধ পণ্য রপ্তানির দরজা মার্কিন রপ্তানিকারীদের সামনে খুলে দিয়েছেন ট্রাম্প, এমন সোনার দিন আগে কখনও আসে নি। এই বিবৃতিতে আমেরিকা কিভাবে লাভবান হতে চলেছে এই চুক্তিতে তার প্রকাশ রয়েছে ছত্রে ছত্রে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে ভারতের কি কি বাণিজ্যিক স্বার্থ পূর্ণ হবে তার কোন উল্লেখ নেই। তাই রাহুল গান্ধী স্লোগান তুলেছেন ‘নরেন্দর সারেন্ডারড’।

এবার একঝলকে দেখে নেওয়া যাক কি আছে বাণিজ্য চুক্তিতে।

আমেরিকা ২৫ শতাংশ শুল্ক নামিয়ে ১৮শতাংশ শুল্ক করবে ভারতের ওপর। লাগু হবে বস্ত্রশিল্প, চার্মজাত দ্রব্য, জুতো, ফার্মাসিটিউকালসে। আগে এই শুল্কের হার ছিল ২/৩ শতাংশ।

এর ফলে শ্রম নির্ভর সেক্টরগুলিকে অসুবিধায় ফেলবে। দাম বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানি কম হবে।

মার্কিন কৃষিপণ্য যেমন ফল,বাদাম,ডাল,সয়াবিন,ডেয়ারি পণ্য,পোলট্রি ইত্যাদি দ্রব্যের ওপর কোন শুল্ক ভারত চাপাতে পারবে না যা দেশের কৃষকদের সর্বনাশ করবে।এর ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের আমেরিকার বৃহৎ ফার্মের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এমএসএমই গুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। স্বভাবতই বেকারি বাড়বে।

শক্তি নিরাপত্তা ঝুঁকিবহুল হয়ে যাবে কারণ কমদামে রাশিয়ার তেল কেনা প্রায় বন্ধ করতে হয়েছে আমেরিকার চাপে। পেট্রোপণ্য আমেরিকার কাছ থেকে বেশী দামে কেনা মানে দেশে তেলের দাম বাড়বে এবং তার ফলস্বরূপ নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি পণ্যের দাম বাড়বে। দেশের মানুষের দারিদ্র বাড়বে। এছাড়াও আমদের আমেরিকার ওপর সবসময় নির্ভর করে যেতে হবে। দেশের শক্তি নিরাপত্তা দূর্বল হয়ে পড়বে। তাছাড়া আমরা কাদের কাছ থেকে তেল কিনব তা আমাদের দেশের সরকার ঠিক করবে না, ট্রাম্প ঠিক করে দেবে ? সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ নয় কি? ইতিমধ্যেই ভারতে ভেনেজুয়েলার তেল বেশী দামে ঢুকতে শুরু করেছে বলে খবর আছে।

দুদেশের মধ্যে ভয়াবহ বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেবে।২০২২ সালে আমদানির তুলনায় তিনগুণ রপ্তানি করত ভারত। গতবছর তা দ্বিগুণে পৌঁছেছে। আগামী বছরগুলিতে এই চুক্তির ফলে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী হবে। বর্তমানে আমেরিকা থেকে আমদানি হয় বছরে ৪,৬০০ কোটি ডলারের পণ্য। এই চুক্তির ফলে তা বেড়ে হবে ১৪,৬০০ কোটি ডলারের পণ্য। আমরা পাঁচ বছরে ৫০,০০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানিতে দায়বদ্ধ। চুক্তিটি তড়িঘড়ি ও অস্বচ্ছ ধোঁয়াশায় ভরা। চুক্তিটি জনসমক্ষে না আনায় ও অতি দ্রুততায় করার ফলে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুবিধাকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দেউলিয়া করবে। আমাদের ডিজিটাল ট্রেড রুলস এর ওপর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।ডেটা লোকালাইজেসনের ওপর কোন চুক্তি হয় নি। আমেরিকার জন্য। ফ্রি ডেটা ফ্লো এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোর্স কোড প্রকাশের কোন পরিকল্পনা করা হয় নি।২০ বছর ধরে ফ্রি তে ট্যাক্স হলিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব খামতির ফলে আমরা বড়রকমের ক্ষতির সন্মুখীন হব। ৫০০ মিলিয়ন ডলার মার্কিনপণ্য কেনার পরিকল্পনা এই চুক্তিতে রয়েছে।

কেন এই অসম বানিজ্য চুক্তি ?

গত ৩০ জানুয়ারি ৩০ লক্ষ পাতার এপস্টিন নথি প্রকাশিত হয়। অনিল অম্বানীর সঙ্গে যৌন অপরাধী ও আন্তর্জাতিক শিশু পাচারকারী জেফ্রি এপস্টিনের কথোপকথন ও কাজকর্ম এখন প্রকাশ্যে। সেই নথিতে উঠে এসেছে মোদীর নাম।এই নথিতে নাম রয়েছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর নামও। হরদীপ স্বীকার করেছেন যে বেশ কয়েকবার তিনি এপস্টিনের সঙ্গে দেখা করেছেন। একজন যৌন অপরাধী ও শিশু পাচারকারীর সঙ্গে তিনি কি কাজের জন্য দেখা করেছিলেন,এই প্রশ্ন উঠে গেছে। নিশ্চই ফিল্ম বা ক্রিকেট বা অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে তিনি এপস্টিনের কাছে যান নি ?

এছাড়াও আমেরিকায় মোদীর প্রিয় বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক গৌতম আদানীর বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলায় সমন আছে। তাই তাকে বাঁচানোর জন্য মোদী ট্রাম্পের সামনে নতজানু হয়ে এই চুক্তি গলঃধরণ করতে বাধ্য হয়েছে।এই প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধি বলেছেন ‘মানুষের ডেটা আমেরিকার হাতে তুলে দিচ্ছে,ও ডিজিটাল বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণও একইভাবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে’।তিনি এও বলেছেন ‘যদি আমরা ক্ষমতায় থাকতাম তাহলে ট্রাম্পকে বলতাম আমাদের আপনার সমান ধরে কথা বলতে হবে,চাকর ভেবে কথা বললে চলবে না।পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে এক আসনে বসালে চলবে না’। আসলে গত এগার বছর মোদীর ভুল বৈদেশিক নীতির জন্য মেরুদণ্ডটা নরম হয়ে গেছে। প্রতিবেশী একটাও দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক নেই। সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকার সহযোগী হিসাবে বিশ্বের দরবারে ভারত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায়।

আন্তর্জাতিক

আধিপত্যবাদের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চিরতুষারের দেশ গ্রীণল্যান্ড

মনিরুল হক

আমরা জানি যে গ্রীণল্যান্ড হল চিরতুষারের দেশ। কিন্তু হঠাৎ -ই সে দেশকে ঘিরে যে ভাবে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে শুধু গ্রীণল্যান্ড নয়, গোটা বিশ্ব রাজনীতির আঙিনাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গত বছর জানুয়ারি মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, গ্রীণল্যান্ডকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসবেন। আর প্রয়োজন হলে এই কাজ সম্পন্ন করতে তিনি

বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা বোধ করবেন না। পরে অবশ্য নিজের বক্তব্য সামান্য সংশোধন করে বলেছেন -'বল প্রয়োগ করব না তবে গ্রীণল্যান্ড আমার চাই'। গ্রীণল্যান্ড বর্তমানে ডেনমার্কের অধীনস্ত একটি স্বায়ত্বশাষিত অঞ্চল। সে দেশের আইনসভা এবং সাধারণ মানুষ দ্বর্থ্যহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, গ্রীণল্যান্ড কিছুতেই আমেরিকার বশ্যতা স্বীকার করবে না। আর ডেনমার্ক-ও ঘোষনা করেছ, গ্রীণল্যান্ডকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় তাদের নেই। গ্রীণল্যান্ড-ডেনমার্কের স্বার্থকে কেন্দ্র করে সমগ্র NATO জোট এককাট্টা হয়েছে এবং বলেছে, প্রয়োজনে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধও গড়ে তুলবে। এই মুহূর্তে NATO এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে কয়েকদিন আগেও ছিল অকল্পনীয়। আবার বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ চিনও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছে এই মহাসংঘাতে। ফলে ভৌগোলিক উত্তাপের সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উত্তাপ যুক্ত হয়ে গ্রীণল্যান্ডের সামগ্রিক উত্তাপকে arithmetic নয়, geometric progression এ বাড়িয়ে তুলছে।

গ্রীণল্যান্ডের মনুষ্য বসতির ইতিহাস চার হাজার বছরেরও বেশি। তবে ১৭২১ সালে ডেনমার্ক-নরওয়ের (তখন দুটি দেশই একজন রাজার অধীনে ছিল) রাজার অনুমতি নিয়ে একজন মিশনারী উপস্থিত হন গ্রীণল্যান্ডে আর সেটাই হল ঔপনিবেশিক যুগের শুরু। এরপর ১৮১৪ সালে দেশ দুটি আলাদা হয়ে গেলে গ্রীণল্যান্ড চলে যায় ডেনমার্কের অধীনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সব জায়গাতেই উপনিবেশ গুলির উপর কতৃত্ব শিথিল হতে থাকে। ১৯৫৩ সাল থেকে আর উপনিবেশ নয়, গ্রীণল্যান্ড হয়ে যায় ডেনমার্কের অংশ। সেখান থেকে প্রতিনিধিও নির্বাচিত হতে থাকে ডেনমার্ক পার্লামেন্টে। ১৯৭৯ সালে গ্রীণল্যান্ডে আংশিক স্বায়ত্বশাসন চালু হয় এবং সে দেশে পার্লামেন্টও গঠিত হয়। ২০০৯ সালে স্বায়ত্বশাসন আরও প্রসারিত হয়। আগামীদিনে আলাদা দেশ হিসাবে গ্রীণল্যান্ডের আত্মপ্রকাশের সম্ভবনা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু গ্রীণল্যান্ড দখল নেওয়ার আগ্রাসী ঘোষণা করে লগ্নী পুঁজির অন্যতম প্রধান প্রতিভূ ট্রাম্প সাহেব শুধু গ্রীণল্যান্ড নয়, শুধু ইউরোপীয় নয়, ঘোটা বিশ্ব রাজনীতিকেই গভীরভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছেন।

গ্রীণল্যান্ডের মূল অপরাধ হল তার আবিস্কৃত এবং সম্ভাবনাময় কিন্তু অনাবিস্কৃত তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদের ভান্ডার। দেশটির উত্তরভাগ এবং বিস্তীর্ণ মধ্যভাগ তিন কিলোমিটার গভীর কঠিন বরফের আস্তরনে ঢাকা। বাকি তিন দিকে শুধুমাত্র উপকূলভাগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মনুষ্য বসতি। এই রকম চরম প্রতিকূল পরিবেশে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানের কাজ খুবই দুরূহ এবং ব্যয় সাপেক্ষ। তা সত্বেও যেটুকু জানা-বোঝা গেছে তাতে বিজ্ঞানীদের অনুমান গ্রীণল্যান্ড খনিজ পদার্থের সঞ্চয়ে অতীব সমৃদ্ধ। তেল, গ্যাস, তামা, সোনা, কোবাল, দস্তা, ইউরেনিয়াম, নিওবিয়াম, মলিবডেনাম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমানে সঞ্চিত আছে দেশটির গর্ভে। এছাড়া কৌশলগত কারণেও আমেরিকা দখল চায় গ্রীণল্যান্ডের।

গ্রীণল্যান্ড জোর করে দখল নেওয়ার পক্ষে ট্রাম্প সাহেবের যুক্তি হল-

১) চীন ও রাশিয়া গ্রীণল্যান্ড ও সন্নিহিত অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে যা প্রতিহত উকরার ক্ষমতা গ্রীণল্যান্ড-ডেনমার্কের নেই।

২) আমেরিকার নিজস্ব নিরাপত্তার জন্যও গ্রীণল্যান্ড তাঁর হিতে থাকার দরকার।

৩) গ্রীণল্যান্ডের মজুত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করা এবং তার সঠিক বন্টন ও ব্যবহার করা।

৪) উত্তর মেরু অঞ্চলের সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করা। এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প সার্বভৌম দেশ কানাডা দখল করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন, গাজার দুর্দশায় কাতর হয়ে তার সৌন্দর্য্যায়ন প্রকল্প রূপায়নের অঙ্গীকার করেছেন এবং এর জন্য সমগ্র গাজা অঞ্চল থেকে সমস্ত অধিবাসীকে পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করার নিদান দিয়েছেন। তাই গ্রীণল্যান্ডের মতো ঘটনায় আমরা আর অবাক হই না বরং আধিপত্যবাদ আর শোষনের নগ্নতম রূপ দেখে চমৎকৃত হই !

তবে গ্রীণল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের এই হ্যাংলামির যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি মনে করছেন, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরও দেরি হলে চীন জাঁকিয়ে বসবে গ্রীনল্যাণ্ড ও সন্নিহিত অঞ্চলে। এদিকে চিনও দুঙ্খী। মহা কমিউনিস্ট চিনের মহা দুঙ্খ - উত্তরমেরু অঞ্চলের সাথে তার কোনো সংযোগ নেই ! তা নেই তো কি হয়েছে, সংযোগ করে নিলেই হয়। ২০১৮ সালে তারা এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে, নাম - 'NEAR ARCTIC STATE'. নিজেদের শ্বেতপত্রের ভিত্তিতে তারা এখন উত্তরমেরু অঞ্চলের বড্ড কাছের ! তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে উত্তর সাগর উজিয়ে, বেরিং প্রণালীর পথে জাহাজ চালিয়ে উত্তর ইউরোপে পৌঁছনো। এইজন্য তাদের পরিকল্পনা 'POLAR SILK ROAD' স্কীমকে কার্যকরী করা। বর্তমানে চিনের সাংহাই থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ আসতে সময় লাগে মোটামুটি ৫০ দিন, সুয়েজ খাল পথে

লাগে ৪০ দিন। আর প্রস্তাবিত উত্তর সাগর ধরে আসলে লাগবে মাত্র ২৫ দিন। এছাড়া দক্ষিনের জলপথে যে সব রাজনৈতিক বাধার সামনে পড়তে হয় নতুন পথে তা থাকবে না বা কম থাকবে। আমরা আগেই বলেছি উত্তরমেরু অঞ্চলের বরফ খুব দ্রুত গলছে। আর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঊর্ধ্বরেখাকেই জাহাজ চলাচলের পক্ষে উপযোগী হবে বলে মনে করছে চিন। চিনের বক্তব্য, এই পথ জাহাজ চলাচলের উপযোগী হলে পূর্ব-পশ্চিম সহযোগীতা বাড়বে, পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হবে, ব্যবসা-বানিজ্য আরও প্রসারিত হবে। মেরু অঞ্চলের গবেষণায় তারা অংশ নিতে পারবে। তবে একটা কথা তারা বলছে না। সেটা হল, POLAR SILK ROAD তৈরি হলে গ্রীণল্যান্ড সহ বিরাট এলাকায় তার কর্তৃত্ব করার সুযোগ হবে। চিনা প্রযুক্তিবিদরা আরও বেশি বেশি ইউরোপ ও গ্রীণল্যান্ডে আসতে পারবে, খনিজ পদার্থ উত্তোলন ও সরবরাহের সুবিধা হবে। খনিজ পদার্থ উত্তোলন একটি ব্যয়বহুল প্রজেক্ট। তার উপর আছে সেই কাঁচামালের নিষ্কাশন ও পরিশোধনের জটিল প্রক্রিয়া। সারা পৃথিবীর খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন ও পরিশোধনের প্রায় ৯০ ভাগ চিনেই সম্পন্ন হয়। তাই তারা এমনিতেই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। শুধু POLAR SILK ROAD নয়, চিন এর সঙ্গে গড়ে তুলেছে 'ARCTIC DIGITAL NETWORK'। এর মাধ্যমে উন্নত যোগাব্যবস্থা গড়ে তোলা, নানান ধরনের অনুসন্ধানমূলক কর্মসূচি কার্যকর করা, গবেষণামূলক কাজকর্মের বিস্তার ঘটানো ও গোয়েন্দাগিরি করার সুযোগও থাকবে। POLAR SILK ROAD প্রকল্প আসলে BELT AND ROAD INITIATIVE এর সংযোজন, এটা ভুলে গেলে ভুল হবে। আর এইসব প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য একটাই- অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার।

আমাদের চোখে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে গ্রীণল্যান্ড। কিন্তু সব ঘটনাই ঘটছে সে দেশের মানুষকে অন্ধকারে রেখে। সে দেশের মানুষ কি চান সে কথা জানতেও চান না কোনো পক্ষ। আমেরিকা হোক বা চিন, যে যত বড শক্তি, সে তত বড় আগ্রাসী। গ্রীণল্যান্ড দেশটি বিশাল, আয়তনে ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ। কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ৫৬০০০ আর দেশটি অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী। এরকম একটা দেশে কোনো উন্নয়ন হবে না, মানুষগুলো এস্কিমো হয়েই থাকবে, এরকম অবস্থা আমি-আপনি মেনে নিলেও নিতে পারি তাই বলে আধিপত্যবাদীরা এইরকম একটা দেশকে ধর্মের হাতে ছেড়ে রাখবে, তাই কখনো হয় !

দেশের খবর

প্রাক্তন সেনা প্রধানের লেখা বই থেকে রাহুল গান্ধির উদ্ধৃতি দেবার প্রচেষ্টায় ক্রমাগত বাধাদান

অমিতাভ সিংহ

সংসদের সাম্প্রতিক শীতকালীন অধিবেশনে যেভাবে দেশের বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীকে প্রথম দিন থেকে বলতে দেওয়া হল না তা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল। শাসক বিজেপি এভাবে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। এটাই কিন্তু প্রথম নয়। রাহুল গান্ধী বিরোধী নেতা হিসাবে সংসদে আসার পর থেকেই সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তির ভিত্তিতে বিতর্কের পরিবর্তে সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধতি অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে নানাভাবে তাঁর বিরোধিতা করা হচ্ছে। গুজরাতের এক মুন্সেফ আদালতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এক বিজেপি নেতা একটি মানহানির মামলা করেন। অভিযোগ রাহুল গান্ধি নাকি সমগ্র মোদি সমাজের মানহানি করেছেন। ওই মুন্সেফ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলায় রাহুল গান্ধিকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড দেন। এর পর অতিদ্রুত তার সাংসদপদ বাতিল করে তার প্রাপ্য সরকারী বাসভবন থেকে উৎখাত করার মত নিকৃষ্টতম কাজ করতে তাদের বাধে নি। এই রায় গুজরাতের ওই জেলার সেশন কোর্ট ও গুজরাত হাই কোর্ট বহাল রাখে। অবশেষে দেশের সুপ্রিম কোর্ট এই রায় বাতিল করে। বিচারকরা বলেন শ্রী গান্ধি আদৌ মোদি সমাজের মানহানি করেননি।

আর মানহানি করার জন্য আড়াই বছর কারাদণ্ডের কোনও নজির বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে নেই। ওই রায় সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে। শ্রী গান্ধি তাঁর লোকসভার সদস্যপদ ফিরে পান।

বিরোধী নেতা হওয়ার পর সেবির প্রধান মাধবী পুরীর সঙ্গে মোদীর কৃপাভাজন বন্ধু আদানীদের যোগসূত্র পাওয়ার ঘটনা সংসদে উল্লেখ করার জন্য তাঁকে বার বার বাধা দেওয়া হয়েছে।তাঁর মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে তাঁকে থামাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০২৫ সালের বর্ষাকালীন অধিবেশনে অপারেশন সিন্দুর ও পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে বলতে গেলেও তাঁকে বলতে বাধা দেওয়া হয়, তাঁর মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরও একটি অধিবেশনে রাহুল যখন শিবঠাকুরের ছবি বুকের সামনে ধরে বলছিলেন 'ডরো মাৎ ডরাও মাৎ', তখনও স্পিকার সরকারপক্ষকে

পয়েন্ট অব অর্ডার তোলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।আর গত ২ ফেব্রুয়ারি স্পীকার নিজেই আসরে নেমে পড়লেন সরকারপক্ষের হয়ে রাহুলের বক্তৃতায় সময় বাধা দিতে। এবিষয়ে নেহেরুর সময়কার একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। স্পীকার ছিলেন পি ভি মবলঙ্কার। তার প্রতি পন্ডিত নেহেরুর অনুরোধ ছিল যেন বিরোধীদের জন্য বেশী সময় বরাদ্দ করা হয়।

কি ঘটেছিল গত ২ ফেব্রুয়ারি ?

সংসদে সবে মাত্র রাহুল গান্ধী দ্য কারাভান নামক পত্রিকাতে প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুল নারাভানের স্মৃতিকথা ‘ফোর স্টারস অব ডেস্টিনি ‘ সম্পর্কে একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ পড়তে শুরু করেন, ‘চিন সেনার চারটি ট্যাঙ্ক ভারতের এলাকায় ঢুকে কৈলাশ রেন্জের দিকে এগোচ্ছিল.’...ঠিক তখনই রাজনাথ সিং এর নেতৃত্বে নো নো নো আওয়াজ উঠল সরকারপক্ষের বেঞ্চ থেকে। তারা রাহুলকে কথা বলতে দেবেন না।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বার দশেক,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বার ছয়েক এবং সংসদ বিষয়ী মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বা নিশিকান্ত দুবেরা বারংজেবার রাহুলকে বাধা দিয়েছেন।

কি ছিল এই বইটাতে ?

প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ নারাভানে ২০২০ সালের ৩১ অগস্টের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তার বয়ান অনুযায়ী সেদিন সন্ধে সওয়া আটটা নাগাদ নর্দান কম্যান্ডের প্রধান লেঃ জেঃ যোগেশ যোশীর একটি ফোনে খবর পান যে চিনের সেনারা চারটি ট্যাঙ্ক নিয়ে পূর্ব লাদাখের রাচিনলা থেকে কৈলাস রেন্জের দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি সত্বর এই বিষয়টি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং,বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর,চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে অবগত করেন। এক ঘন্টা কেটে গেলেও তাদের কাছ থেকে কোন নির্দেশ আসে নি।এদিকে ট্যাঙ্কগুলি তখন কয়েকশো মিটারের মধ্য এসে গিয়েছে। আমাদের সেনারা ইলুমিনেটিং রে তাদের উদ্দেশ্যে দেখিয়েছে। এর অর্থ যে তোমাকে সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে যে তুমি অন্য দেশের সীমানায় চলে এসেছ।এখনই থামো। সাড়ে নটা নাগাদ প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আবার ফোন করা হয়। তখনও পর্যন্ত ওপর (ভারত সরকার) থেকে কোন স্পষ্ট নির্দেশ আসে নি। তারপরেই পিএলএ বা চিনের সেনাদের কাছ থেকে ফোন আসে যে তারা আর এগোচ্ছে না,আগামীকাল সকালে এবিষয়ে বৈঠক হবে। কিন্তু তখনও লাল ফৌজ এগিয়ে চলেছে।

রাত দশটার পর তিনি বিকল্প রাস্তা দেখা শুরু করলেন। সাড়ে দশটার সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তাকে জানান যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ক্ষ্ম যা উচিৎ মনে করেন, তাই করুন (যো উচিত সমঝো ও করো)। অর্থাৎ দায়িত্বটা সেনাপ্রধানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়া,যেমন তিনি সংসদ থেকে পালিয়ে গেলেন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভয়ে।

এই ঘটনার সামান্য কিছু দিন আগে চিনা সেনার সঙ্গে ভারতীয় সেনার হাতাহাতিতে ২০ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয়। সেসময়ে চিনা সেনা ভারতীয় সীমানায় ঢুকে কয়েক হাজার বর্গকিমি জায়গা দখল করে নেয় বলে রাহুল অভিযোগ করেছিলেন। তখন মোদী বলেছিলেন যে ‘ ভারতের এলাকায় কেউ ঢুকে আসেনি বা কেউ ঢুকে বসে নেই’।মোদীর এই বিবৃতির পর চিন বলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে আমরা (পড়ুন চিন) অনুপ্রবেশ করিনি।ভারতীয় সেনারাই অনুপ্রবেশ করায় নিহত হয়েছে । মোদীর এই বক্তব্য ভারতীয় সেনা বাহিনীকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয় । প্রধানমন্ত্রী মোদী ভয়ে চিনের নাম নেননা।

একটা গোলা ছোঁড়া হলে তা যদি একটা চিনা ট্যাঙ্কের ওপর গিয়ে পড়ে তাহলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তাই তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন ‘আমি তখন নিজেকে খুব একা মনে করেছিলাম’। সেনারা দাঁড়িয়ে আছে মিডিয়ম আর্টিলারি নিয়ে,কিন্তু সরকার কোনও নির্দেশ দিচ্ছে না। আমাদের দেশ তো সেনাপ্রধান বা সেনাবাহিনী চালায় না পাকিস্থানের মত,চালায় রাজনৈতিক নেতারা। তাই যুদ্ধ ঘোষনা করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা তো তাদের ওপরেই ন্যস্ত। যা তারা সেসময় পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আসলে এই বই মোদী ও রাজনাথের চরিত্র ও দেশভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কি অজুহাতে বাধাদান? বিজেপির বক্তব্য ছিল অপ্রকাশিত বই থেকে রাহুল পড়তে পারেন না। আবার স্পীকার এককাঠি বাড়া।তিনি যুক্তি দিলেন সংসদের নিয়মানুযায়ী এই বইটির অংশবিশেষ একটা পত্রিকায় বেড়িয়েছে, ফলে পত্রিকা থেকে পড়তে পারেন না। রাহুল প্রশ্ন করেন ‘এই বইতে কি এমন আছে যে মোদী সরকারের সবাই এত ভয় পাচ্ছে?’ রাহুলের বক্তব্য প্রাক্তন সেনাপ্রধানের লেখা অনুযায়ী এর সঙ্গে চিন ভারত সম্পর্ক,দেশের নিরাপত্তা, সেনাবাহিনীর সম্মান জড়িত।সুতরাং তাকে এই অংশটি পড়তে দেওয়া হোক।কিন্তু সরকারপক্ষ তাকে চুপ করাবার জন্য ক্রমাগত চিৎকার করায় অধিবেশন ভন্ডুল হয়ে যায়।

যুক্তিটা কি ?

নারাভানে সেনাপ্রধান ছিলেন ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত।অবসর নেওয়ার পর তিনি এই বইটি লেখেন। নিয়মানুযায়ী ২০২৩ সালে তিনি বইটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে পাঠান প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য। এর আগে জেনারেল ভিপি মালিক বা জেএস ধীলনের বই মন্ত্রকের অনুমতি পেয়েছে। কিন্তু নারাভানের এই বইটি তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও অনুমতি আজও আসে নি। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রাহুল গান্ধী জেনারেল নারাভানের ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ সালের একটা টুইট দেখান। যেখানে তিনি বলেছেন এই বইটি কিনতে পাওয়া যাবে একটা লিংকে ক্লিক করলেই। অথচ গত দশদিন এবিষয়ে তুমুল আলোচনা চলার পর হঠাৎ করে বইটির প্রকাশক জানালেন যে বইটি নাকি প্রকাশিত হয়নি। তারা এই বইটি প্রকাশের অনুমতি চেয়ে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছিলেন তিন বছর আগে তাও অনুল্লেখিত এই বয়ানে। এখন প্রশ্ন কে সত্য বলছেন ? রাহুল গান্ধী বলেছেন তিনি সেনাপ্রধানকেই বিশ্বাস করেন। অতএব ধরে নেওয়া যায় কোথাও না কোথাও এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল যা দ্য কারাভান পত্রিকার সাংবাদিক সুশান্ত সিং এর হাতে এসেছে ও তিনি বইটির রিভিউ করেছেন।ফলে এই বই অপ্রকাশিত তা ঠিক তথ্য নয়। এই বইয়ের বিষয়বস্তু যা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদীসহ অন্যান্য নেতাদের মেরুদণ্ডহীনতার ঘটনা তুলে ধরেছে তা চাপা দেওয়ার জন্যেই রাহুল গান্ধীর কণ্ঠস্বরকে রুখতে এই কাজ করেছে। এর আগে পুলওয়ামা কান্ডে বিজেপির নেতা ও সেসময় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক মোদী শাহের মিথ্যার বেসাতির ঝাপড়ি খুলে দিয়েছিলেন। সরকারপক্ষ তখন বলেছিল তা মিথ্যা ও মালিকের বিশেষ অ্যাজেন্ডা আছে। এবারও কি প্রাক্তন সেনাপ্রধানের ক্ষেত্রে একই কথা বলবেন বিজেপি নেতারা ? নারাভানের দেশভক্তি ও দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন ?

পরিশেষে বলতে চাই গণতন্ত্রের মূল ভিতটাই দুর্বল হয়ে যায় যদি কথা বলতে না দেওয়া হয়। সরকারের উচিৎ ছিল বিরোধী দলের নেতার বক্তব্য শুনে তার জবাব দেওয়া। চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জওহরলাল নেহেরু স্পীকারকে সংসদের অধিবেশন ডাকতে বলেন ও যাবতীয় বক্তব্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে শুনে তার জবাব দিয়েছিলেন। মোদীর মত সংসদ থেকে পালিয়ে যাননি। আজ স্পীকারের বিরুদ্ধে তাই অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হল কংগ্রেসকে যাতে সই করলেন প্রায় সব প্রধান বিরোধী দলগুলি,একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। তাদের নেতা আরও দুএকদিন সময় চেয়েছেন। এখনও ২/১ দিন সময় চাই তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিতে ?

দেশের খবর

সুপ্রিম কোর্ট বাংলার এস.আই.আর-এর সময়সীমা বাড়াল, সন্দেহ ও আশংকা থেকেই গেল

সুকুমার মিত্র

সুপ্রিম কোর্ট বাংলার ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়সীমা বাড়িয়েছে, ফলে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ অন্তত দুই সপ্তাহ পিছিয়েছে। কমিশনের অপরীক্ষিত সফটওয়্যার ১.৩৬ কোটি ভোটারকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার বেশিরভাগই নামের অমিল ও বয়সের অস্বাভাবিক ব্যবধানের কারণে। এদিকে যাচাই প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলছে।

সুপ্রিম কোর্ট ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এস.আই.আর) ভোটার তালিকার দাবি-আপত্তি যাচাইয়ের মেয়াদ বাড়িয়েছে। ফলে ১৪ ফেব্রুয়ারির পরে অন্তত দুই সপ্তাহ পিছিয়ে যাবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ। সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস সুর্য কান্তের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ (জাস্টিস জয়মাল্য বাগচী ও এন ভি অঞ্জারিয়া সহ) বর্তমান জটিলতার কারণে যথাযথ যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি চিফ জাস্টিস সূর্যকান্ত স্পষ্ট করে বলেন, তএস.আই.আর-এ কেউ বাধা দেবে না, রাজ্যগুলোর কাছে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।দ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, দাবি-আপত্তির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব শুধু নির্বাচন নিবন্ধন অফিসারদের (ই.আর.ও)। কমিশন-নিযুক্ত মাইক্রো-অবজার্ভাররা কেবল জেলা নির্বাচন অফিসার (ডি.ই.ও) ও ই.আর.ও-দের সহায়তা করবেন। আপত্তি যাচাই করতে ই.আর.ও-রা বাধ্য এবং নথির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারবেন।

প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ৮,৫০৫ গ্রুপ বি অফিসারকে ১০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার মধ্যে জেলা কালেক্টর বা ই.আর.ও-দের কাছে পাঠাতে হবে। নির্বাচন কমিশন তাদের বায়ো-ডেটা ও অভিজ্ঞতা যাচাই করে মাইক্রো-অবজার্ভার হিসেবে নির্বাচন করবে, দুদিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেবে এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করবে। অযোগ্য হলে বদল করা হবে। হিংসার অভিযোগে কমিশন আদালতে জানায়, হুমকি, শত্রুতা ও ফর্ম-৭ পোড়ানোর ঘটনায় বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও এফআইআর হয়নি। কেন্দ্রের সলিসিটর

জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'ভারতের সংবিধান সব রাজ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য;এই বার্তা পৌঁছানো জরুরি।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শ্যাম দিবান 'আউট-অফ-স্টেট' মাইক্রো-অবজার্ভার ও বাংলা অনুবাদের নামের অমিল থেকে 'ম্যাস এক্সক্লুশন'-এর আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গত সপ্তাহে মমতা নিজে আদালতে হাজির হয়ে অভিযোগ করেছিলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে। আদালত উদ্বেগ স্বীকার করে ই.আর.ও-দের কর্তৃত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং আশ্বাস দিয়েছে, কোনো ব্যাপক বাদ পড়বে না।

আদালতের হস্তক্ষেপ হলেও থেকে গেছে গভীর জট। রিপোর্টার্স কালেকটিভের তদন্তে উঠে এসেছে; কমিশনের অপরীক্ষিত সফটওয়্যার ১.৩৬ কোটি ভোটারকে (রাজ্যের প্রায় ১৮ শতাংশ) অসম্ভব টাইট ডেডলাইনে নাগরিকত্ব, পরিচয় ও ভোটাধিকার প্রমাণের জন্য শুনানিতে ঠেলে দিয়েছে। অফিসিয়াল রেকর্ড, কমিশনের অভ্যন্তরীণ ডেটা, সফটওয়্যার পর্যবেক্ষণ ও বুথ-লেভেল এজেন্টদের সাক্ষাৎকারে জানা গেছে, কমিশন আদালতে দাবি করছে 'নো অটোমেটেড নোটিস জেনারেশন', অথচ বাস্তবে কেন্দ্রীভূত অ্যালগরিদম 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র কারণে গণহারে নোটিস তৈরি , যা ই.আর.ও-রা হাজার হাজার সই করে অনুমোদন করেছেন।

২০০২ সালের বাংলা ভোটার তালিকা অপরীক্ষিত অনুবাদ অ্যালগরিদমে ইংরেজিতে ডিজিটাইজ করে বর্তমান দাবির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এতে ১.৩৬ কোটি সন্দেহজনক ফ্ল্যাগ উঠেছে। রাজ্যের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার স্বীকার করেছেন, তাড়াহুড়োয় সফটওয়্যারে ত্রুটি হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক ফ্ল্যাগ তৈরি হয়েছে। প্রথমদিকে বুথ লেভেল অফিসাররা ছোটখাটো ত্রুটি এড়িয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু নতুন ফিল্টারে জাল আরও বড় হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে ইআরও-দের প্রতিটি কেসে বিচার করার কথা থাকলেও মাত্র দুই সপ্তাহের ডেডলাইনে হাজার হাজার কেস সামলানো কার্যত অসম্ভব। ঝুঁকি এড়াতে তারা ইরোনেট অ্যাপে বাল্ক প্রিন্ট করে সই করেছেন। কলকাতার এক ই.আর.ও নাম গোপনে রাখার শর্তে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'প্রায়ই প্রতিদিন ৪,০০০ সমনস সই করছি।' সি.ই.ও-র এক সিনিয়র অফিসারও স্বীকার করেছেন, 'এত ভলিউমে ছোট ত্রুটি ফিল্টার করা অসম্ভব।'

জানুয়ারি ২৪ পর্যন্ত ডেটা অনুযায়ী ১.৩৬ কোটি সমন তৈরি হয়েছে, ৯৫.৩৯ লাখ পৌঁছেছে, ৩০ লাখ শুনানি হয়েছে;২০% সম্পন্ন, অথচ যাচাই মাত্র ৭.২৪%। বাকি ১.২ কোটি কেস আদালতের নির্দেশে আরও বাড়বে।

ত্রুটির প্রকৃতি মূলত নামের অমিল;যেমন 'জুলেখা' বনাম 'খালখো', 'মোহাম্মদ' বনাম 'এমডি', 'শেখ' বনাম 'এসকে', 'চট্টোপাধ্যায়' বনাম 'চ্যাটার্জি'। এছাড়া একই পূর্বপুরুষে একাধিক ভোটার বা মা ও সন্তানের বয়সের অস্বাভাবিক ব্যবধান। এসব অমিল মুসলিম-প্রধান জেলায় বেশি দেখা গেছে;মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও কলকাতা পোর্টে। বুথ স্তর অফিসাররা বলছেন, বেশিরভাগই তুচ্ছ এবং স্থানীয়ভাবে সহজে ঠিক করা যেত।

বাস্তবে ই.আর.ও-রা 'কনভেয়র বেল্ট'-এর মতো প্রতিদিন হাজার হাজার নোটিস সই করছেন। আদালতের দাবির সঙ্গে অসংগতি অভিমত সিইও অফিসিয়াল জানিয়েছেন, ইআরও ইরোনেট খুলে জেনারেটেড নোটিস দেখে প্রিন্ট করছেন;পূর্ণ মনোযোগ কি আংশিক, সেটা ডিগ্রির প্রশ্ন।দ ফলে এই অ্যালগরিদমিক চাপ আসলে ই.আর.ও-র স্বাধীন বিচার নয়, বরং ১.৩৬ কোটি মানুষকে বিপদে ফেলছে।

এদিকে আদালতের হস্তক্ষেপে ব্যাকলগ আরও বাড়ছে নির্বাচনের আগে। তৃণমূল পদবি, উপভাষার অমিলকে ইস্যু করছে, কমিশন অবৈধ অভিবাসী খুঁজছে। সংবিধান দেশে সরকার গঠনে অনর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের মূল সুরে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল দেশবাসী বা রাজ্যবাসীকে ভোট প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। বাংলায় একটি প্রবাদ রয়েছে, 'না আচালে বিশ্বাস নেই'। কারণ বিহার এস.আই.আর-এর পর সন্দেহ বেড়েছে শুধু নয় সেই প্রক্রিয়াকে আরও জটিলতর করা হয়েছে। কমিশনের অপরীক্ষিত সফটওয়্যার বিপুল সংখ্যক ভোটারকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করায় যাচাই প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলছে, যা ই.আর.ও-দের ওপর অ্যালগরিদমিক চাপ বাড়িয়েছে। রাজনৈতিক বিতর্ক, নামের অমিল ও বয়সের অসঙ্গতি নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও আদালত আশ্বাস দিয়েছে কোনো ব্যাপক সংখ্যায় ভোটারের নাম বাদ পড়বে না। সব মিলিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে এস.আই.আর ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশকে ঘিরে উত্তেজনার পরিবেশ রয়েছে, রয়েছে ধোঁয়াশা।)

ডি.এ.মামলার ঐতিহাসিক রায় এবং সরকারি কর্মচারী আন্দোলন

শ্যামল কুমার মিত্র

‘কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ অ্যান্ড আদার্স ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আদার্স’ মামলার ঐতিহাসিক সুপ্রিম রায় কার্যকর করতে সরকারকে বাধ্য করাতে প্রয়োজন কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের সার্বিক ঐক্য এবং যুথবদ্ধতাঞ্চএই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কোন বিতর্কিত বক্তব্য ঐক্যের পরিবেশ বিপন্ন করতে পারে? কিন্তু কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট না করলে একাধিক বিভ্রান্তির অবসান হবে না (১)আমাদের সংগঠন বিশ্বাস করে কমবেশি ১০ লক্ষ কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী যে মামলার রায়ে প্রভাবিত হবেন, সেই মামলা পরিচালনার খরচ কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সমাজের কাছ থেকেই আসা উচিৎঞ্চএটি কর্মীসমাজের আত্মমর্যাদার প্রশ্নঞ্চসে কারনে এই মামলা পরিচালনার খরচ সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় আমাদের সংগঠন(কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ) কোন রাজনৈতিক দল বা গণসংগঠনের থেকে ১ নয়া পয়সা অনুদান গ্রহন করে নি (২)সংগ্রামী যৌথমঞ্চ আমাদের ১০,০০০ টাকার অনুদান চেক মারফৎ দিয়েছিলেনঞ্চকোন ২০ লক্ষ টাকার অনুদান আমাদের সংগঠনকে ঐ মঞ্চ দেন নি। ওঁরা মামলার সঙ্গে যুক্ত অন্য কোন সংগঠনকে তা দিয়ে থাকতে পারেন। ওঁরা সেই সংগঠনের নাম প্রকাশ্যে আনলে বিভ্রান্তির অবসান হয়। (৩)শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানীয় সর্দার আমজাদ আলির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ২০১৬ সালে যখন কোন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মামলা নিতে চান নি রাজরোষে পড়ার ভয়ে,তখন আই.এন.টি.ইউ.সি.র প.বঙ্গ শাখার তৎকালীন সভাপতি (প্রয়াত) শ্রদ্ধেয় রমেন পান্ডে মহাশয়ের উদ্যোগে তিনি মামলা নেন এবং এই মামলা আজ যে ‘ঐতিহাসিক জয়’ আমরা পেয়েছি তার রুপকার এই সর্দার আমজাদ আলি এবং (প্রয়াত) রমেন পান্ডে। কিন্তু তাঁকে আমরা মামলা থেকে সরিয়ে দিয়েছি এই বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ন সেচ্ছায় মামলা ছাড়েন এবং মামলার ব্রিফসহ এন.ও.সি. দিয়ে দেন। তাঁর উপর আমাদের আস্থা,বিশ্বাস এবং ভরসার কোন ঘাটতি সেদিনও ছিল না,আজও নেই। (২) পরিকল্পিত প্রচার হচ্ছে আমাদের আইনজীবিরা বিনা পয়সায় মামলা লড়েছেন। এই বক্তব্য অসত্য। শ্রদ্ধেয় সর্দার আমজাদ আলি,সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাননীয় রইফ রউম এর সাথে আমাদের কথামত সম্পূর্ন সম্মান দক্ষিণা আমরা দিয়েছি। সিনিয়র অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য,ফিরদৌস শামিমদের সম্মান দক্ষিণার যে অর্থাঙ্ক তা আমরা দিতে পারি নি— এ কথা সত। কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যমত অর্থ তাঁদের দিতে চেষ্টা করেছি,অর্থাঙ্ক নিশ্চিত ভাবেই তাঁদের সম্মান দক্ষিণার থেকে কম। তাই আমরা আইনজীবিদের অর্থ দিই নি-- এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার। একথা স্বীকার করতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই,বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য,ফিরদৌস শামিম, গোপা বিশ্বাসরা এই মামলাটা লড়েছেন যতটা না আইনজীবি হিসাবে,তার থেকে অনেক বেশি সংগ্রামের সাথী হিসাবে তাঁরা এই আইনি লড়াইকে একটা ‘মিশন’ হিসাবেই নিয়েছিলেনঞ্চআমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সুপ্রিম কোর্টে অনারেবল জাস্টিস সঞ্জয় কারোল এবং অনারেবল জাস্টিস প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে যখন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করতে শুরু করলেন,তখন জাস্টিস সঞ্জয় কারোল বলেছিলেন,"Mr.Bhattacharyya–it is your baby–you know better–we are with your baby."আক্ষরিক অর্থে বিকাশবাবু মামলাটাকে সন্তান স্নেহে লালন-পালন করেছেন। মামলা নিয়ে আলোচনার আগে কৃতজ্ঞতা পর্বটা সেরে ফেলতেই হয়। আমাদের আইনজীবিরা আমাদের বক্তব্য, যুক্তি,তথ্য,পরিসংখ্যান মাননীয় বিচারপতিদের সামনে অননুকরনীয় দক্ষতা ও পেশাদারিত্বে উপস্থাপন করে ‘জয়’ ছিনিয়ে এনেছেন। ওঁনাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাই। অর্থদপ্তরের (প্রয়াত) সহকর্মী স্বপন দে এই মামলায় যুক্ত হয়েছিলেন রাজরোষ এবং রাজপ্রলোভন উপেক্ষা করে,ব্যক্তি কর্মচারী হিসাবে চূড়ান্ত সাহসের পরিচয় দিয়ে,শুধুমাত্র কর্মীস্বার্থের লক্ষ্যে। বস্তুত যখন কোন সংগঠন মামলায় বিকাশবাবুকে যুক্ত করার প্রয়োজনে মামলায় ‘Add Party’ হওয়ার সাহস করেন নি,তখন একজন ব্যক্তি কর্মচারী স্বপন দে শুধুমাত্র বৃহত্তর কর্মীস্বার্থে যে দুঃসাহস প্রদর্শন করেছিলেন,তার উচ্চ প্রশংসা করতেই হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বপন দের প্রয়ানের পর তাঁর স্ত্রী এই মামলায় যুক্ত হন এবং আজও তিনি এই মামলার সঙ্গে যুক্ত। তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। ২০১৬ সালে আমরা শাসক দলের সমর্থক সংগঠন বাদে সমস্ত সংগঠনকে নিয়ে একত্রে মামলা করার লক্ষ্যে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছিলাম,কিন্তু সফল হই নি,একটি ছোট সংগঠন ছাড়া কোন সংগঠন এই মামলায় যুক্ত হননি। এটি আমাদের বড় ব্যর্থতা। ১৩.০৪.২০২২ সরকারি কর্মীদের আরো একটি সংগঠন মামলায় যুক্ত হন। আর কোন সংগঠন আজ পর্যন্ত এই মামলায় যুক্ত হন নি। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সুপ্রিম কোর্টে মামলার শেষ পর্বে এই মামলায় যুক্ত হতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ

করে দেন। তবে তাঁদের আইনজীবিদের সওয়াল করার সুযোগ দেনঞ্চতাঁদের আইনজীবি সিনিয়র অ্যাডভোকেট গোপাল সুব্রমনিয়ম ২ দিন তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন সাবমিশন রেখেছেন,তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। সিনিয়র অ্যাডভোকেট পি.এস.পাটোয়ালিয়া, সিনিয়র অ্যাডভোকেট করুণা নন্দী কর্মীপক্ষের হয়ে প্রশংসনীয় সাবমিশন রেখেছেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্যাট এবং কলকাতা হাইকোর্টে সর্দার আমজাদ আলি এবং বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের অনবদ্য যুগলবন্দী এবং ফিরদৌস শামিম,গোপা বিশ্বাস, মাসুম আলি সর্দার,প্রবীর চাটার্জী(প্রত্যেকেই আইনজীবি)দের প্রশংসনীয় সঙ্গতের অসাধারণ রসায়ন স্যাটে ২ টি এবং কলকাতা হাইকোর্টে ৪ টি (মোট ৬ টি) 'ঐতিহাসিক জয়' উপহার দেয় কর্মীসমাজকে। কলকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি নিশীথা মাত্রে এবং তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ এবং মাননীয় বিচারপতি দেবাশীষ করগুপ্ত এবং শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চের চাপে অনিচ্ছুক রাজ্য সরকার যথাক্রমে ০১.০১.২০১৮ থেকে কার্যকর ১৫% এবং ০১.০১.২০১৯ থেকে কার্যকর ২৫% অতিরিক্ত ডি.এ. দিতে বাধ্য হন। এই অতিরিক্ত ৪০% ডি.এ. অবশ্যই আদালতের অবদান। ২০২২ সালে যে ২টি মামলা কলকাতা হাইকোর্টে 'বর্ষসেরা মামলা' হিসাবে বিবেচিত হয় তার মধ্যে অন্যতম এই মামলাঞ্চ রাজ্য সরকার গত ২০.০৫.২০২২ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের (D.A. is a legally enforceable fundamental right of the Employees) বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এস.এল.পি.দাখিল করেন। গত ২৮.১১.২০২২ থেকে মামলা 'তারিখ-পে-তারিখ' অপসংস্কৃতির খপ্পরে পড়ে। অবশেষে গত ০৫.০২.২০২৬ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং প্রশান্ত কুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন। ১২৪ পাতার এই রায় এক কথায় শুধু 'ঐতিহাসিক' ই নয়, সারা দেশের কর্মচারী আন্দোলনে কর্মচারীদের হাতে এক ব্রহ্মাস্ত্র ।বস্তুত এর আগে ডি.এ.কে আইনি অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে কখনো এমন সুনির্দিষ্ট কোনও 'রায়' ছিল না। বর্তমান সরকার তার 'কর্মী বিদ্বেষী নীতি'র বাস্তব প্রয়োগে 'রোপা— ২০১৯' এ 'ডি.এ.' শব্দটাই উল্লেখ করেন নি। গত ৫ ফেব্রুয়ারির সুপ্রিম রায় কর্মী সংগঠনগুলির হাতে 'রোপা২০১৯' এ 'এ.আই.সি.পি.আই.অনুসারে ডি.এ.র আইনি অধিকার 'লিপিবদ্ধ করার দাবিতে মামলা করার পক্ষে এক বলিষ্ঠ আইনি হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। আমাদের সংগঠন 'রোপা---২০০৯' এর প্রেক্ষিতে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মামলা চালিয়ে,আক্ষরিক অর্থে,'দেউলিয়া'। এখনো বড় অঙ্কের দেনা শোধ করার 'দায়' আমাদের উপরঞ্চতাই আর্থিক কারনেই 'রোপা--২০১৯' নিয়ে মামলা করার মত আর্থিক সক্ষমতা আমাদের নেইঞ্চআমরা আশা রাখি অন্য সংগঠনগুলি এই 'সুপ্রিম রায়'কে হাতিয়ার করে 'রোপা---২০১৯'এ 'এ.আই.সি.পি.আই.অনুসারে ডি.এ.র আইনি অধিকার' মামলা করে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবেন। ১২৪ পাতার এই রায়ের ১২১ নম্বর পাতাটি হুবহু তুলে ধরছি।

59.2 To receive dearness allowance is a legally enforceable right that has accrued in favour of the respondents--employees of the State of West Bengal.

59.3 Given its in corporation in ROPA Rules–the AICPI is the standard to be followed by the appllant ---State of West Bengal for determination of òexisting emoulments.59.4 The employees of the appellanté--State shall be entitled to release of arrears in accordance with this judgement for the time 2008-2019.

এবার ১২২ নম্বর পাতা দেখা যাক । Interim direction issued(পড়ুন গত ১৬.০৫.২০২৫ তারিখের অন্তবর্তী নির্দেশ যাতে বকেয়া ডি.এ.র ২৫% মেটাতে বলা হয়েছিল)as herein above shall be complied with immediately.অর্থাৎ এপ্রিল--২০০৮ থেকে ডিসেম্বর – ২০১৯ পর্যন্ত এ.আই.সি.পি.আই.অনুসারে বকেয়া ডি.এ.র ২৫% অবিলম্বে দিতে হবে। এবার ১২৩ নম্বর পাতায় যাওয়া যাক। 59.7 The import of the Committee (সুপ্রিম কোর্ট মাননীয়া ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়ে দিয়েছেন) shall be–in consultation with the State authorities to determine (a) total amount to be paid—(b)schedule of payments which then the State shall be bound to follow (c) Periodically verify the release of the amouts.

এত সুনির্দিষ্ট করে বকেয়া ডি.এ.প্রদানের সময়সূচি ভিত্তিক সুপ্রিম নজরদারিতে রায় কার্যকর করানোর সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন ও অভূতপূর্বঞ্চবস্তুত মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় 'রায়' কার্যকর করার বিষয়টি রাজ্য সরকারের উপর না ছেড়ে নিজেদের দায়িত্বে রেখেছেনঞ্চএটি কি রাজ্য সরকারের প্রতি সুপ্রিম অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ? এবার দেখা যাক সংবিধানের ৩০৯ নম্বর ধারায় কি বলা হয়েছে। "Article 309 of the Indian Constitution empowers Parliament and State Legislatures to pass laws governing the recruitment and conditions of service for public servants.It also allows the PresidentSfor Union ServicesV and GovernorsSfor

State ServicesV to make rules for these aspects until specific legislation is ই Ligislature."এই ধারা থেকে স্পষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়োগ,চাকুরি শর্তাবলী, বেতন-ভাতা-পেনশন নির্ধারন করার অধিকার কেবলমাত্র রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের। সংবিধানের ৩০৯ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্য/কেন্দ্র সরকার কোন 'রুল' তৈরি করলে ,তবে সেই রুলে প্রদত্ত অধিকার আইনগ্রাহ্য এবং আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু দাবি যতই যুক্তিগ্রাহ্য,ন্যায্য হোক না কেন, যদি সেই দাবির সমর্থনে সংবিধানের ৩০৯ নম্বর ধারায় কোন 'রুল' তৈরি না হয়ে থাকে, তবে তার বিচার আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভুত। আমাদের মামলাটা আমরা করতে পেরেছিলাম,তার কারণ বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত সংবিধানের ৩০৯ নম্বর ধারায় তৈরি 'রোপা-২০০৯' এ এ.আই.সি.পি.আই. অনুসারে ডি.এ.দেওয়ার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছিলেনগ্ধ 'রোপা- ২০০৯' হচ্ছে সেই 'রুল' যা আমাদের মামলা করার আইনি সুযোগ এনে দিয়েছেগ্ধতাই ডঃ অসীম দাশগুপ্তকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে।'কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ' ডঃ দাশগুপ্তের রেখে যাওয়া অস্ত্র খুঁজে বার করে তা প্রয়োগ করেছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক রায়ের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হল এই রায় 'রোপা--২০১৯' কে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলগ্ধসুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব করতে নেই। এখন দেখার বিষয় কোন সংগঠন/সংগঠনগুলি এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। কোন সংগঠন এই দায়িত্ব নিলে,আমাদের সংগঠন মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ,আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হলে,নিঃশর্তে তা দিতে প্রস্তুত। গত ৫ ই ফেব্রুয়ারি আমরা মুখ্যসচিব ও অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মহোদয়দের রায়ের কপিসহ আমাদের বক্তব্য পৌছে দিয়েছি। সরকার কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পূর্বোক্ত ২ আধিকারিককে আদালত অবমাননার নোটিশ পৌছে দিয়েছি। আমরা আইনিভাবে যা করার তা করব। বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন,'সরকারি কর্মীদের সব সমস্যার সমাধান আদালত করে দেবে না। '' ডি.এ.র প্রশ্নে আদালতের রায় এনে আমরা কর্মীদের হাতে একটা অস্ত্র তুলে দিয়েছি। কিন্তু সেই রায় কার্যকরে সরকারকে বাধ্য করতে প্রয়োজন আন্দোলন। কর্মীদের আত্মমর্যাদা বোধ থাকলে তাঁরা আন্দোলন করেই দাবি আদায় করবেন।'' ২০১১ র জুন মাসের পর থেকে রাজপথে মিছিল,সমাবেশ,অবস্থান,ধারাবাহিক অবস্থানের মত অনেক আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু শূন্যগর্ভ আস্ফালন করে লাভ নেই,রূঢ় বাস্তব হল বর্তমান সরকার সেই সব আন্দোলনে ন্যূনতম কোন গুরুত্ব দেন নি। দাবি পূরন তো দূর অস্ত,সরকারের মুখ্যমন্ত্রী,কোন মন্ত্রী,মুখ্যসচিব,অর্থসচিব একদিনের জন্যও কর্মী নেতৃত্বকে আলোচনায় বসার সুযোগটুকুও দেন নিগ্ধএকটা ফ্যাসিস্ত সরকার এমনটা করবেন– এটাই স্বাভাবিক। তাই সরকারকে দাবি পূরনে বাধ্য করার একমাত্র হাতিয়ার 'ধর্মঘট'। ২০১২ সালের ১০ই জানুয়ারি সরকার পুলিশকর্মীদের ইউনিয়ন/অ্যাসোসিয়েশন করা নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন(১৯২৩ সাল থেকে পুলিশকর্মীদের এই অধিকার ছিল)। তারপর অস্বাভাবিক দ্রুততায় একাধিক দপ্তরে ইউনিয়ন/অ্যাসোসিয়েশন করা নিষিদ্ধ হল। লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সব গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কর্মীরা অর্জন করেছিলেন,তার প্রায় সবই কেড়ে নেওয়া হল। অর্থাৎ ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির আগেই আমরা এই সরকার কর্মচারী সমাজের প্রতি কতটা বিদ্বেষ এবং প্রতিহিংসা পরায়ন তা জেনেছিলাম। তারপরেও 'ধর্মঘট' এর মত কর্মসূচি আহ্বান করার আগে আমাদের যে পূর্বপ্রস্তুতি এবং সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন ছিল,তা কি আমরা নিয়েছিলাম?কর্মীসমাজ 'ধর্মঘট' এর আহ্বানে কতটা সাড়া দিতে পারেন তার কোন আগাম সমীক্ষা কি আমরা করেছিলাম? রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি 'ধর্মঘট' আহ্বান করলেন,আমাদের মত প্রায় সব সংগঠন সমর্থন জানালেন। কিন্তু ' ব্রেক অফ সার্ভিস',' বেতন কাটা' এবং 'ডাইস নন' এর মত সরকারি হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে 'আহুত ধর্মঘট' চূড়ান্ত ব্যর্থ হল সরকার নিশ্চিত হয়ে গেলেন ,কর্মচারী আন্দোলন দমন করতে সরকারি হুমকিই যথেষ্ট। একটা ফ্যাসিস্ত কর্মীবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট'এর মত নির্ণায়ক অস্ত্র প্রয়োগ করার আগে প্রয়োজন আস্তিনে লুকিয়ে রাখা ছুরি-কাঁচি ফেলে দিয়ে কর্মী সংগঠন গুলির দলীয় রাজনীতি বর্জিত ইস্যুভিত্তিক সার্বিক ঐক্যগ্ধরাজ্যকর্মীদের কমবেশি ৭ লক্ষ পদ শূন্য– নিয়োগের কোন উদ্যোগ নেই, নামমাত্র বেতন/মজুরিতে কার্যত কোন রকম সামাজিক সুরক্ষা না দিয়ে,আক্ষরিক অর্থে ,ক্রীতদাস মালিকের কায়দায় এই সরকার চুক্তি নিযুক্ত কর্মীদের দিয়ে সরকারি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন,আজকের দ্রব্যমূল্যের বাস্তবে ৬০০ টাকা মাসিক বেতনে সরকারি কাজ করিয়ে নিতেও সরকারের লজ্জা নেই,'রোপা--২০১৯' এ 'ডি.এ.' শব্দটাই নেই,বাড়িভাড়া ভাতা ১৫% থেকে কমে ১২% তথাকথিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশকৃত বেতনের ৪ বছরের বর্ধিত বেতন সরকার চুরি করে নিয়েছেন,৪০% ডি.এ.বকেয়া– এর থেকে খারাপ অবস্থা আর কি হতে পারে? এই নজিরবিহীন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও কর্মচারীদের সিংহভাগ কর্মী সংগঠনের ছদ্মবেশে শাসক দলের

গণসংগঠন রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে কর্মচারী আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে চরম শত্রুতামূলক অবস্থানে থেকে সরকারের ব'কলমে শাসক দলকে পেটের লিভারের মত রক্ষায় স্বঘোষিত দায়বদ্ধ। বাকিদের একটা অংশ ভাবছেন,'অন্যেরা দাবি আদায় করুক, দাবি আদায় হলে আমিও পাব' আন্দোলনে অংশ নিয়ে রাজরোষে পড়ব কেন বাপু' ফলে আন্দোলন করার জন্য সংখ্যা কোথায়? কারখানার আন্দোলন কারখানার গেটে হবে,রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনকেও টেনে আনতে হবে সরকারি অফিসে,দপ্তরে,ভবনে। ডি.এ.মামলার রায় কার্যকর হলে কমবেশি ১০ লক্ষ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মী উপকৃত হবেন। এই ১০ লক্ষ উপভোক্তার ১০% আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জনপ্রতি ১০০ টাকা করে পাঠালে আমরা ১ কোটি টাকা পেতাম। ঐ অর্থাঙ্কে আজও আমরা পৌছাতে পারি নি। অর্থাৎ উপভোক্তাদের ১০ শতাংশও যৎসামান্য আর্থিক অনুদান দিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়ান নি,অথচ ঈশ্বর/আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছেন মামলায় যেন আমরা জিতি। সিংহভাগ কর্মচারীর নিরাসক্ত ভূমিকায় সংখ্যায় নিতান্তই স্বল্প কিছু কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বার বার আর্থিক অনুদান দিতে হয়েছে। ঈশ্বর/আল্লা তো দাবি মিটিয়ে দেবেন না,দাবিপূরনের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি কর্মচারীর অংশগ্রহণ। অনেকে বলেন ভয়ে আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন না কর্মচারীরা,তাদের প্রশ্ন করি মামলার প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিছু অনুদান দিলে কে জানছে?'ভয়'এর প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে। ১০ লক্ষ উপভোক্তার ১০% হচ্ছে ১ লক্ষ। ১ লক্ষ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা যদি সুপ্রিম রায় অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে রাজপথে নামতেন,মিছিল করে নবান্নে যেতেন,সরকারের সাহস হত 'রায়' সম্পর্কে এতটা উদাসীনতা প্রদর্শনের? অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের একটা বড় অংশ শারীরিক ভাবে যথেষ্ট সক্ষম। তাঁরা রাজপথে নামলে সরকার তাঁদের কি শাস্তি দেবেন?তাঁরা তো অবসরগ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আওতার বাইরে চলে গেছেন। সোজা কথাটা সোজা ভাবে বলাই ভাল। ভয় বা আতঙ্ক একটা অজুহাত, আসলে সবটাই সুবিধাবাদ।আমরা দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় থেকে একটা অস্ত্র এনে দিয়েছি কর্মীসমাজের হাতে। এবার কর্মী সমাজকে স্থির করতে হবে তাঁদের অবস্থান। সরকার হচ্ছে মালিক,কর্মচারীরা শ্রমিক। বিশ্বের কোন দেশে শ্রমিকরা মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে মালিক শাস্তির খাঁড়া নামিয়ে আনেন না? কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ বা ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকপক্ষ হিসাবে যখন শ্রমিকরা আওয়াজ তোলে,মালিক তা শুনতে বাধ্য হন। আমাদের ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ কর্মীপক্ষ,নিদেন পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মচারী যদি আন্দোলনে নামেন, সরকার নতজানু হতে বাধ্য। নেতৃত্ব আন্দোলনের ডাক দেবেন,কিন্তু কর্মী সমাজকে তো সেই আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে 'পেনশন' নিয়ে হুমকি দিচ্ছেন তাতে বলাই যায় এই শাসক আবার ক্ষমতায় এলে পুরান পেনশন স্কিম বন্ধ হতে চলেছে। সরকারে শাসক হিসাবে কে আসবেন তা রাজনীতিকদের বিষয়। চাকুরি শর্ত অনুসারে সরকারি কর্মী সংগঠন তা নিয়ে কিছু বলার অধিকারি নন। তাছাড়া শাসকদলের পরিবর্তনে সরকারের কর্মী সংক্রান্ত ভূমিকার বদল হবে— এটাও অতিসরলীকরণ। কিন্তু নির্বাচন আসন্ন হলে সরকারের ব'কলমে শাসক দল অনেকটা দুর্বল অবস্থানে থাকে। তাই সরকারকে নতজানু করার,দাবিপূরনে বাধ্য করার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। এখন কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সমাজকে স্থির করতে হবে, তাঁরা আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদার প্রদর্শন করবেন, না নিরাপদ দূরত্বে বসে ঈশ্বর/আল্লার কাছে প্রার্থনা করবেন অন্যেরা যেন দাবিগুলো আদায় করে এনে দেয়, তাঁরা শুধু ভোগ করবেন। সিদ্ধান্ত নিতে হবে কর্মীসমাজকে। ব্যক্তি নিরপত্তার অজুহাতে সরকারের গুডবুকে থাকতে চাওয়ার সর্বনাশা সুবিধাবাদ হল কর্মী আন্দোলনের সব চেয়ে বড় শত্রু।

লেখক, সভাপতি, কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ, পশ্চিমবঙ্গ (আই.এন.টি.ইউ.সি)।

২০০২ সালের ভোটারও শুনানির নোটিশ পাচ্ছে : মুস্তারি বানুর মামলা

প্রসেনজিৎ দত্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার বর্ডার লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা মোস্তারি বানু। এস আই আর পর্বে তাকে শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে।২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলে ডাক পাওয়ার কথা নয়,কিন্তু তবু তিনি ডাক পেয়েছেন। একইরকম অভিজ্ঞতা বহুমানুষের।মোস্তারি বানু বুঝেছেন এস আই আর নিয়ে তাঁর মত হেনস্থা হচ্ছেন বহু মানুষ।গরীব,প্রান্তিক সংখ্যালঘুরা সব চেয়ে বেশি হেনস্থার শিকার।

এইরকম পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে এস আই আর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছেন মোস্তারি

বানু। তাকে এই ব্যাপারে সহায়তা করেন সি.পি. আই (এম) দল এবং আইনজীবি হিসাবে সাহায্য করেন সব্যসাচী চ্যাটার্জী। গত ১১ নভেম্বর,২০২৫ সালে আইনজীবি সব্যসাচী চ্যাটার্জী ও আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জী তাঁর হয়ে সুপ্রিমকোর্টে এই মামলা দায়ের করেন।গত ৯ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে সি.পি. আই (এম) কার্যালয় এ কে গোপালন ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মোস্তারি বানু নিজেই এই কথা জানান। তিনি জানান বলা হয়েছিল ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তারা বৈধ ভোটার। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ২০০২ - এর ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্বেও ভোটারদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।আমার ক্ষেত্রেই সেই ঘটনা ঘটেছে।আমিও আজ হয়রানির শিকার। এই পরিস্থিতিতে আমি নিজে থেকেই পার্টির সহযোগিতা এবং পরিবারের সদস্যদের মত নিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নেই।

গত ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এস আই আর মামলায় সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে তিনি এস আই আর 'র বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বা তিনিই প্রথম পিটিশন দাখিল করেছেন। মোস্তারি বানু এই সাংবাদিক সম্মেলনে জানান এই বিষয়ে প্রথম পিটিশনকারী মমতা ব্যানার্জী নয়, তিনিই অর্থাৎ মোস্তারি বানুই প্রথম পিটিশনকারি।

আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জী এই সাংবাদিক সম্মেলনে জানান,মোস্তারি বানু ' র পিটিশনের মূল বক্তব্য এই যে এনুমারেশন ফর্ম চালু করাই অসাংবিধানিক।মানুষের কাছে তথ্য চাওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র প্রমাণ করার জন্য যে তাঁরা নাগরিক নন।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপুল অংশ শুনানির নোটিশ পাচ্ছেন। কারণ ইলেকশন কমিশন নাগরিক নয় মনে করেই তাদেরকে হিয়ারিংয়ে ডেকে পাঠাচ্ছে। এই বিষয়টি নজরে আনতে চেয়েছিলাম।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সি.পি. আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য নীলোৎপল বসু। তিনি বলেন আমাদের পার্টি বিহারে এস আই আর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় থেকেই এই প্রক্রিয়ার ধারণা,পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ পদ্ধতির বিরোধিতা করেছে। সংবিধান অনুযায়ী ভোট দিতে হলে নাগরিক হওয়া জরুরি। কিন্তু নাগরিকত্বের বিচার করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন কে দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে একাধিক মামলা হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকেও মামলা করা হয়েছে।

আপনজনের কথা

আরজ আলি থেকে আমির চাঁদ— ট্রাডিশন কি পাল্টাবে না ?

অরুণাভ মিশ্র

ধরুন তার নাম রাবিয়া বিবি নয় রবেজান বিবি। ২০২৬ নয় প্রায় একশো বছর আগে ১৯৩২ সালে মারা গেছিলেন তিনি। তার ছেলের নাম ধরুন আমীর চাঁদ শেখ নয়, আরজ আলী মাতুব্বর। মৃতা মায়ের ছবি তুলিয়ে রেখেছিল সে মাকে প্রতিদিন ছবিতে দেখবে বলে। ধরুন ঘটনা কাছের কৃষ্ণনগরের নয়, আবার খুব দূরের নয়, অবিভক্ত বাংলার বরিশালের লামচরি গ্রামের। ফল ভয়াবহ। মৌলবাদীদের কোপে পড়লো আরজ। তার মায়ের কবর দেওয়ার অনুষ্ঠান বয়কট করলো মৌলবাদী মুসুল্লীরা। আরজ আর তার বন্ধুরা মিলে অতি কষ্টে তার মায়ের দেহ কবরস্থ করেছিল , শেয়াল কুকুরের ভক্ষ্য হতে না দিয়ে। আর নিজে সেদিন থেকে হয়েছিলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা। নিজের দুটি চোখ আর দেহদান করেছিলেন বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে। স্বাধীন বাংলাদেশে সেই প্রথম মরণোত্তর দেহদান। আর জীবন্ত অবস্থায় নিজের দাঁত, চুল আর নখ বয়ামে ভরে নিজের কবর তৈরি করে গিয়েছিলেন। পরে তার যুক্তিবাদী রূপ দেখে তাকে কমিউনিস্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছিল পাকিস্তানি পুলিশ।

আরজের জন্মের ১২৫ তম বর্ষ পূর্তিতে এখন আরজের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি দেখলাম আমরা আমীর চাঁদ-এর ঘটনায়। যুক্তিবাদী আমীর, পরিবেশ কর্মী আমীর, নদী আন্দোলনে যুক্ত আমীর, শিক্ষক আমীর, ৯৫ বছর পরে আরজের মত একইভাবে, স্বাধীন ভারতে, বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের সাংবিধানিক নাগরিক দায়িত্ব সম্বলিত ভারতে, মৌলবাদের সমর্থন পুষ্ট প্রশাসন ও সরকারের মদতে, মৃত মায়ের কর্নিয়া দানের মত মহৎ কাজ করে গ্রেপ্তার হলেন। রাজ্যের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজত দিয়ে দিল আর প্রশাসন কিছু জানে না? সব জানে! ইঙ্গিতে কাজ করা পুলিশ সব জানে! গোটা একটা মরণোত্তর দেহদান আর অঙ্গদান কর্মসূচির মত মানবিক ও কুসংস্কার মুক্তির কাজকে হুমকি দিয়ে আর অপদস্থ করে গোবেচারা মুখ করে থাকলেই হবে। ডাইনি হত্যা হয় যখন এই সরকার কোথায় থাকে? জলাভূমি আর নদী ভরাটে কোথায় থাকে? মৌলবাদী আর সরকারের বোঝাপড়া এখানে নগ্ন।

মরণোত্তর কর্নিয়া দানের মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কা তাদের কর্নিয়া জনিত অন্ধত্ব প্রায় শূন্য করে ফেলেছে। আমাদের দেশে তামিলনাড়ুতে, কেরালায় কর্নিয়া দানের হার অনেক বেশি। পশ্চিমবাংলায় তা অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আর গণদর্পণ বহুদিন এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এখন আরো বহু সংগঠন এই প্রয়াসে যুক্ত। অপবিজ্ঞান প্রসারে যত্নশীল কেন্দ্রীয় সংখ্যাগুরু মৌলবাদীদের সঙ্গে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানিক পথে লড়তে না পেরে কেউ কি সংখ্যালঘু মৌলবাদকে উস্কানি দিচ্ছে? তারা জানেনা, এর পরিণতি হতে পারে ভয়ঙ্কর! আর সংখ্যাগুরুর মৌলবাদী প্রচার সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের উৎসাহিত করছে। এই অবস্থায় কেন্দ্র আর রাজ্য উভয় সরকারের ভূমিকা সংবিধান স্বীকৃত কাজকে ভীতি যোগাচ্ছে, পিছিয়ে দিচ্ছে।

করণীয় হতে পারতো সামনে থাকা দৃষ্টান্ত। ৫২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কেরালা সরকার গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সরকারি 'কেরালা ইনস্টিটিউট অফ অর্গান এন্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট (KIOTT)' তৈরীর ঘোষণা করেছে, যেখানে কম খরচে যেকোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও এ-সংক্রান্ত গবেষণা করা যাবে। এখন এধরনের কাজ ৯০ শতাংশই হয় প্রাইভেট হাসপাতালে। তাজা দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে উল্টো পথ নেওয়ার দুরভিসন্ধি স্পষ্ট!

আমরা তাই পথেই থাকবো। অবিলম্বে আমীরের নিঃশর্ত মুক্তি চেয়ে ও সম্মানহানীর প্রতিবাদে। প্রশাসনকে এই গর্হিত কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আমরাতো অঙ্গ দিয়ে জীবন জয়ের গান গাইবোই। চাইলে আমীরের মতো আমাদেরও গ্রেপ্তার করো। (fb থেকে)

তুঝে সালাম

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

কবে আমাদের পরিচয় হয়েছিল মনে নেই তবে আমীর চাঁদের কথা ও ব্যাবহারের জন্য আমার সাথে ওর সম্পর্কটা বেশ শক্তপোক্ত। পরিচয়ের সূত্র হলো আমরা দুজনেই মহাত্মা গান্ধির অনুগামী। তবে সেখানেই ব্যাপারটা থেমে থাকেনি। আমীর চাঁদ কিশোর বাহিনীর সদস্য এবং প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলায় সেই সংগঠনের হয়ে সমাজসেবা করতে যায়। আমীর চাঁদ স্থানীয় একটি ক্রীড়া সংগঠনের সাথেও যুক্ত। আমীর চাঁদ নদী ভাঙন নিয়ে সচেতনতা মূলক কাজ করা বেশকিছু সংগঠনের সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত। আমীর চাঁদ মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদানের প্রচার প্রসার করেই থেমে থাকেনা, মৃতদেহ থেকে কর্নিয়া তুলে স্বযত্নে সেসব যথা স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজেও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। আমীর চাঁদ স্কুল শিক্ষক এবং পরিবারের কর্তা ও সন্তানের পিতা।

২০২৪ সালে আপাত নিরীহ এবং একদমই সাদামাটা এহেন আমীর চাঁদের ইচ্ছা হলো সাগর থেকে পাহাড় পর্যন্ত যাত্রার সাথী হবে। আমাকে জানালো সেসব। আমি আমার সাধ্য মতো ওর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা করলাম। ২০২৫ সালে ওরা যখন গঙ্গাসাগর মেলায় যাচ্ছে, আমি দেখা করতে গেছিলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। জীবনে প্রথমবার কৃষ্ণনগরে যাওয়ার পর আমার দুপুরের ভাত ডাল জুটেছিল আমীর চাঁদের বাড়িতেই। বিভিন্ন সময়ে আরও অনেক কথা আলোচনা হয়েছে আমাদের ভেতরে। কোনোদিনও ওর ভেতরে অহংকার ঔদ্ধত্য কিছুই দেখতে পাইনি। বরাবরই একদম নরম মনের মানুষ আমীর চাঁদ। সেদিন অর্থাৎ ওকে যেদিন পুলিশ গ্রেফতার করে, আমাকে রাত এগারোটা নাগাদ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছিল। তারপর থেকে ও এবং ওদের পরিবারের মুক্তির দাবীতে লড়াইও হলো বিস্তর। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আমীর চাঁদ সেখ ও তার পরিবার। এছাড়াও এই কদিনে বহু মানুষ ওকে নিয়ে লেখালেখিও করেছেন সমাজ মাধ্যমে।

কি মনে হচ্ছে, আমীর চাঁদ হিরো হয়ে গেছে? হিরো তো আগেই ছিলো ওর কাজের মাধ্যমে। হয়তো সবাই ওকে চিনতেন না। এবার তো চিনলেন। শুধু রাজনৈতিক পরিচয় নয়, যারা আমীরের মহান কর্মকাণ্ডের জন্য ওকে ভালোবেসে ফেলেছেন তাদের কাছে অনুরোধ, ওর পাশে দাঁড়াতে চাইলে ওর করা কাজগুলোর সাথে থাকুন। তাতে আমীর একা নয় উপকৃত হবে গোটা সমাজ।

বিজেপির মিথ্যা অভিযোগে সাসপেন্ড জনপ্রিয় মুসলিম প্রধানশিক্ষক পুনর্বহাল

সুকুমার মিত্র

উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার নৌজহীল প্রাইমারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক জান মোহাম্মদকে ঘিরে যে নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ ঘটেছে, তা আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের নগ্ন রূপকে প্রকাশ করেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়, অথচ

কোনো প্রমাণ ছিল না। পরে তদন্তে প্রমাণিত হয় অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সরকার তাঁকে পূর্ণ বেতনসহ পুনর্বহাল করেছে। এই ঘটনাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে;শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানোর প্রবণতা কতটা ভয়াবহ হতে পারে।

অভিযোগ ছিল স্কুলে নামাজ পড়ানো হয়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না, হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়া হয়। অথচ ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক;সবাই একবাক্যে বলেছেন, প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, কোনো ধর্মীয় বৈষম্য নেই। ছাত্ররা মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে প্রমাণ করেছে অভিযোগের অসারতা। স্কুলে অধিকাংশ ছাত্র হিন্দু, শিক্ষক-কর্মচারীরাও হিন্দু, এবং সকলে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। অভিভাবকরা বলেছেন, তাঁদের সন্তানরা নিয়মিত পড়াশোনা করছে, কোনো ধর্মীয় চাপ নেই। গ্রামবাসীরাও এটিকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছেন।

তদন্তে উঠে এসেছে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্কের পরেই অভিযোগ ওঠে। জান মোহাম্মদ দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিয়ম মেনে, কিন্তু রাজনৈতিক চাপের কারণে তাঁকে নিশানা করা হয়। এটি প্রমাণ করে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। একজন সৎ শিক্ষককে মিথ্যা অভিযোগে অপমানিত করা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে।

এখানে মূল প্রশ্ন হলো;আমরা কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির মঞ্চে পরিণত হতে দেব? শিক্ষা হলো সমাজের ভিত্তি। এখানে ধর্ম, জাতি বা রাজনীতির বিভাজন ঢুকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জান মোহাম্মদের ঘটনা আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিথ্যা অভিযোগ তুলে একজন শিক্ষককে অপমানিত করা যায়, এবং প্রশাসনও কখনো কখনো সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে।

সরকার ও প্রশাসনের উচিত প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখা, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া এবং শিক্ষকদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। জান মোহাম্মদের পুনর্বহাল ন্যায়বিচারের জয়। তবে এই জয় আমাদের মনে করিয়ে দেয়;শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো হলে সমাজের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। শিক্ষা হোক নিরপেক্ষ, শিক্ষক হোক সম্মানিত, আর ছাত্ররা পাক মুক্ত পরিবেশে শেখার সুযোগ।

স্মরণ

নিরঞ্জন হালদার (১৯৩২-২০২৬)

সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী নিরঞ্জন হালদার প্রয়াত হলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। ১৯৬২,র ৭ মার্চ তিনি যোগ দেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। সাংবাদিকতাই নিরঞ্জনের প্রধান পরিচয়। ছিলেন সহ-সম্পাদক পদে। ১৯৯৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সেখানে তিনি কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি মাঞ্চনবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওতপেরোত ভাবে। তিনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের (ইন্ডিয়ান সেকশন) সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। ছিলেন নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনেরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

১৯৩২ সালে পয়লা জুলাই অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার গৌরীকোণা গ্রামে নিরঞ্জন হালদারের জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাশ করেন। তাঁর কর্মজীবনের শুরু শিক্ষকতা দিয়ে। কলকাতার গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্সে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ছাত্রজীবন থেকেই জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে পুলিশের রোষানলেও তাঁকে পড়তে হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময়ে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সরব হওয়ায় আবারও সরকারি পীড়ন নেমে এসেছিল তাঁর উপর।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। 'ইকোনণ্ণমিক্স অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি', 'এআইসিসি ইকোনমিক রিভিউ, 'পিস নিউজ' এবং বাংলাদেশের 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসংখ্য লেখা। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী দেহদান করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

রমেশ চন্দ্র সেন

হাতে দড়ি বাঁধা মানুষটি পাঁচ বারের সংসদ সদস্য, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র রমেশ চন্দ্র সেন। ওঁর অপরাধ হচ্ছে দুটো।

এক) তিনি আওয়ামীলীগ করেন।

দুই) তিনি একজন হিন্দু।

ওঁর তিন নাম্বার অপরাধ হচ্ছে তিনি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আসনের একজন জনপ্রিয় সংসদ সদস্য। বারবার মীর্জা ফখরুলকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সংসদ সদস্য হয়েছেন।৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভুমিকা রাখা এই মহান দেশপ্রেমিকের অপরাধ হচ্ছে তিনি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে লালন করেন।

জামায়াত নামক একদল নরপশু যেদিন থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে সেদিন থেকেই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ এক মৃত্যু উপত্যকা ও অভিশপ্ত জনপদ ছাড়া আর কিছুই নয়।৬ ই আগষ্ট জেল থেকে ৭০০ জঙ্গি ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের এক এক করে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে জনপ্রিয় মানুষদের জেলে ঢুকানো হয়েছে। সর্বশেষ এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখেছিলেন ছাত্রলীগের নেতা সাদ্দামকে বিনা অপরাধে কারাগারে ঢুকিয়ে তার মৃত সন্তান ও মৃত স্ত্রীকে জেলখানায় হাজিরা দিতে। হ্যাঁ , এটাই আজকের বিএনপি ও জামায়াতের অভিশপ্ত বাংলাদেশ।

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল মজিদ হুমায়ূন স্যার হত্যার কথা আপনাদের মনে আছে? হাসপাতালের বিছানায় অসুস্থ মানুষটার হাতে হাতকড়া পড়িয়ে রেখেছিল ইউনূস সরকার।এসব হত্যার বিচার একদিন বাংলার মাটিতেই হবে।বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়া চৌধুরীর লাশ কবর দিতে যারা বাঁধা দিয়েছে, তার জানাযায় যারা বাঁধার সৃষ্টি করেছে, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাদল ভাইয়ের কবরে যারা আগুন দিয়েছে তাদের কোনদিনও ক্ষমা হবে না।

২০০১ সালের বিএনপি ও জামায়াতের দেশব্যাপী সন্ত্রাস ও ১ লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর ২৬ হাজার আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের হত্যার ইতিহাস যারা ভুলে ক্ষ্ম রাজাকার রাজাকারক্ষ্ম স্লোগান দিয়েছে , সেই উন্মাদ প্রজন্মের চোখে মানবতা আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বাস্তবতা।

বিশ্বজিৎ হত্যার পর যারা বড় বড় স্ট্যাটাস প্রসব করেছে , জামায়াত শিবিরের প্রসব বেদনায় কাতরে উঠেছে তোফাজ্জেলের মৃত্যুতে তাদের প্রসব বেদনা কই? ভাত খাইয়ে হত্যা করা ছাত্রলীগ কর্মী তফাজ্জল হত্যার বিচার পায়নি তাদের পরিবার। মাত্র ৫ দিনের শিশু দেখেছে তার পিতা ছাত্রলীগ নেতা মাসুদকে কীভাবে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে জামায়াত শিবির।শামীম মোল্লার ক্ষ্ম পানিক্ষ্ম আর্তনাদ আজও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। শুধু জয় বাংলা লেখার অপরাধে তপু ও রায়হানকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হলো । ওদের কোনো পরিবার আজ পর্যন্ত বিচার পায়নি।শাউ মাউ হাদীর রাষ্ট্রীয় জানাযা , আবু সাঈদের পরিবার কয়েক শো কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পেলেও তপু ও রায়হানরা ন্যায় বিচার পর্যন্ত পায়নি। বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে কাঁদে, কাঁদছে। ইউনূসের মবোক্রেসির কাছে সমগ্র বাংলাদেশ যেন আজ অসহায়।

এত তাড়াতাড়ি ‘গোপালগঞ্জ ট্রাজেডি’ ভুলে গেলেন? দুই শিশু সন্তানের জনক সোহেলকে নৃশংসভাবে এনসিপির খায়েশ মেটাতে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন সোহেলের বুকে গুলি করা হয়নি , গুলি করা হয়েছিল তার দুই শিশু সন্তানের বুকে। ইমনের পায়ে গুলি করার পর তার লাশ টেনে হিচড়ে বুট চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।রিকশা চালক রমজানকে খুব কাছ থেকে গুলি করে বিএনপি ও জামায়াতের খায়েশ মেটানো হয়েছে।

বিএনপি ও জামায়াতের রাজনৈতিক খায়েশ মেটাতে কোনদিন দূর্নীতি ও অপরাধ না করা ব্যারিস্টার সুমন , বাকের ভাই খ্যাত আসাদুজ্জামান নূর ও বিখ্যাত কলামিস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে। বিচারের নামে বিচারিক আদালতে চলছে বিএনপি ও জামায়াতের টমেটো ট্রায়াল। বুদ্ধিবেশ্যারা আজ বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।শায়নের কণ্ঠে এখন আর কোন প্রতিবাদী গান শুনতে পাচ্ছিনা।গোয়েবলসীয় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমের নির্লজ্জ হাসির সাথে ইউনূসের দানব ঠোঁটের হাসি আজ বাংলার ১৭ কোটি মানুষকে লজ্জা দিচ্ছে।

রমেশ চন্দ্র সেন একজন সৎ রাজনীতিবীদ ছিলেন। দীর্ঘ ৬০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে তার কোন দূর্নীতির চিহ্ন নেই। ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে ভালোবাসাই যেন কাল হয়ে দাঁড়ালো উনার জন্য। ইচ্ছে করলে তিনি দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সৎ ও সাহসী এই রাজনীতিবীদ তা করেননি। মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ও বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ কসাই কাদের ও গো আযমদের দখলে। তবুও তিনি পালিয়ে যাননি।

২০২৪ সালের ১৬ আগষ্ট ঠাকুরগাঁও নিজ বাসা থেকে এই জনপ্রিয় সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করে বিনাবিচারে জেলে দেওয়া হয়। রহস্যজনক মৃত্যু বলে নুরুল মজিদ হুমায়ূন স্যারের মতো রমেশ চন্দ্র সেনকেও পরিকল্পিত হত্যা করেছে বিএনপি ও জামায়াতের ইউনূস সরকার। এসব ভবিষ্যৎ ভেবেই হয়তো নবারুণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।’ তিনি লিখেছিলেন—

'যে পিতা সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে ভয় পায়
আমি তাকে ঘৃণা করি।'
যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে
আমি তাকে ঘৃণা করি—
যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরাণী
প্রকাশ্য এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না আমি
তাকে ঘৃণা করি।'

সত্য সবসময় সুন্দর।
লুসিড ড্রিম

সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক গত ১০ ফেব্রুয়ারি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন জ্জ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৬। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত উদার শিক্ষানুরাগী পরিবারে। তাঁর পিতামহ সৈয়দ আবুল হোসেন ফার্সি ও সংস্কৃত দুই ভাষাই শিখেছিলেন। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাধর মহারাজ বা স্বামী অখণ্ডনন্দ'র সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর প্রীতির সম্পর্ক। আব্দুর রাজ্জাক এর পিতা সৈয়দ আলি জাকের নগর(খড়গ্রামে) তাঁর প্রয়াতা বালিকা কন্যা আজিজার নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সহ শিক্ষামূলক আজিজা স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আলি জাকের সাহেবের বোন সৈয়দা হাসনা খাতুন ইন্দ্রাণী গ্রামে তাঁর পিতার দানের জমিতে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্দ্রাণী হাসনা মায়ানী হাই স্কুল। সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক আজীবন এই বিদ্যালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এর পর তাঁর পিতার দান করা জমিতে অসম্ভব পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠা করেন সরকার অনুমোদিত নগর (খড়গ্রাম) কলেজ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে তিনি আর.এস.পি দলের প্রচারে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে আসেন। পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ও কমিউনিস্ট নেতা সনত রাহা'র প্রভাবে ১৯৬দ্র সালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে পার্টি ভাগ হয়ে গেলে তিনি সি.পি.আই তে থাকেন। ওই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপদ উপেক্ষা করে পার্টির অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার নীতির জন্য তিনি সিপিআই ত্যাগ করেন ও ইউ.সি.পি.আই. দলে যোগ দেন। তিনি এই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে কান্দি , নগর , তাঁর গ্রাম মহম্মদপুর সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন বিদ্যালয়, ক্লাব, সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে ও প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাঁর নশ্বরদেহে মাল্যদান করা হয়। কয়েক সহস্র মানুষ তাঁর জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে ১১ ফেব্রুয়ারি বিকালে নগর কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, পুত্রবধূ , নাতি ও বৃহৎ পরিবারের অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণমুগ্ধ গ্রামবাসীদের রেখে গিয়েছেন।

ইতিহাস

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও মহাত্মা গান্ধি

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

- ৪ -

পৃথ্বী সিং আজাদের কাহিনী

বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ পরাধীন ভারতে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী সশস্ত্র বিপ্লবী ! ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় এসে তিনি গদর পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লালা হরদয়ালের সংস্পর্শে আসেন এবং গদর পার্টিতে যোগ দেন। সশস্ত্র পথে দেশকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে তিনি দেশে ফিরে এসে গ্রেফতার হন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং তাঁকে অন্যান্য গদর বিপ্লবীদের সঙ্গে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই জেলে বন্দি বিপ্লবীদের ওপর যে অত্যাচার হত সে কাহিনি অনেক বিপ্লবী লিখে রেখে গিয়েছেন। সেই সব কাহিনি থেকে জানা যায় যেসকল বিপ্লবী জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসম সাহসী প্রতিবাদ জানিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করেছিলেন পৃথ্বী সিং তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৯২১ সালে অন্যান্য অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে পৃথ্বী সিংকেও দেশে ফেরত নিয়ে আসা হয়। জাহাজে তারা মাদ্রাজ বন্দরে পৌঁছন। আদেশানুযায়ী পৃথ্বী সিংকে মাদ্রাজ জেল থেকে যখন কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল তখন তিনি চলন্ত ট্রেন থেকে জীবনের ঝুঁকি

নিয়ে লাফ দিয়ে পালান। মারাত্মক আহত অবস্থায় ভোররাত্রে তিনি নিকটবর্তী এক দরিদ্র কৃষকের কুটিরে গিয়ে পৌঁছন? রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত আজাদকে দেখে কুটিরের দম্পতি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আজাদ লিখেছেন, কিন্তু তিনি চিৎকার করে 'দেশভক্ত' আর 'স্বরাজ' শব্দ দুটি উচ্চারণ করতেই তাঁরা বুঝতে পারে এই ব্যক্তিটি স্বদেশী। কেননা ১৯২১-এ দেশজুড়ে গান্ধিজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল এবং এই শব্দগুলির সঙ্গে দেশের মানুষের পরিচয় ঘটেছিল। এই দম্পতি তাঁর হাত-পায়ের লোহার শিকল কেটে দেয়। জায়গাটা ছিল দক্ষিণ ভারতে। তাই ভাষার সমস্যা ছিল, আর গ্রামবাসীরা এত দরিদ্র ছিল যে তাদের নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করাই দুষ্কর ছিল। তিনি তাই ওই অবস্থার উপায়ান্তর না দেখে নিকটবর্তী রেল স্টেশনে গিয়ে ধরা দেন। তাঁকে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ও কাছের শহর রাজমহেন্দ্রীর জেলে বন্দি করা হয়। সেখান থেকে ১৯২২-এর নভেম্বর মাসে যখন তাকে পশ্চিম ভারতের কোনও জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তিনি আবার চলন্ত ট্রেন থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। যে জায়গাতে তিনি পালান সেটি নাগপুরের কাছে। বিভিন্ন শহরে ও জনপদে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠকদের সাহায্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে গ্রেফতারি এড়িয়ে সৌরাষ্ট্রের ভাবনগরে চলে আসেন। এখানে তিনি 'স্বামী রাও' নামে পরিচিত হন এবং ক্রীড়া ও ব্যায়াম শিক্ষকের পেশা গ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন ও ওই অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনের দক্ষ সংগঠকে পরিণত হন। কিন্তু পৃথ্বী সিং সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী তাই যোগাযোগ করেন চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে। চন্দ্রশেখর আজাদ তাকে পরামর্শ দেন সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে বিপ্লবের রণকৌশল জেনে আসার জন্য। এই সাক্ষাৎ-এর অব্যবহিত পরেই ১৯৩১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ-এর আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চন্দ্রশেখর আজাদ শহিদ হন।

করাচি কংগ্রেস

পৃথ্বী সিং ১৯৩১-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে করাচিতে আসেন। কিন্তু তার মূল লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে বিপ্লবের পাঠ গ্রহণ করা। ওই করাচি কংগ্রেস অধিবেশন ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। কেননা সদ্য ভগৎ সিং ও সঙ্গীদের ফাঁসি হয়েছে। বিরাট সংখ্যক যুবক এই অধিবেশনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গান্ধিজি ওই যুবকদের বলেন, 'এই ঘটনায় আমার হৃদয় থেকে অবিরত রক্ত-ক্ষরিত হচ্ছে।' পৃথ্বী সিং লিখেছেন, চারপাশে পুলিশের গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধু গদর বিপ্লবীদের অনেকের সঙ্গে এখানে তার দেখা হয়। তিনি তাদের চিনতে পারেন কিন্তু পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থায় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অন্ধ্রের বুলুসু শাম্বমূর্তির সাহায্যে সীমান্ত গান্ধি খান আব্দুল গফফর খানের সঙ্গে দেখা করেন। পৃথ্বী সিং নিজের প্রকৃত পরিচয় দিতে সীমান্ত গান্ধি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হন। পৃথ্বী সিং জানতে চান তাকে রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য কোনও সাহায্য করা সীমান্ত গান্ধির পক্ষে সম্ভব হবে কিনা। পৃথ্বী সিং লিখেছেন, 'ভারতীয় বিপ্লবীরা গান্ধিজির 'সত্য ও অহিংসা' নীতি ভারতের মুক্তির সহায়ক হবে এই বিশ্বাসে আস্থা রাখতে পারেনি। গান্ধিজির যাঁরা অনুগামী, তাঁরা কিন্তু সহিংস বিপ্লববাদীদের খুব শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের দেশপ্রেমও ওঁদের মুগ্ধ করত। তবে অহিংস পন্থাতেই তাদের আস্থা ছিল।'

সীমান্ত গান্ধি পৃথ্বী সিং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দাদা ডা. খান সাহেবের ছেলেকে দিয়ে তাকে পেশোয়ার পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে নির্ধারিত বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গী নিয়ে আফগানিস্থান অতিক্রম করে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছন। সে এক রোমহর্ষক কাহিনি। মস্কোতে তিনি প্রাচ্যের বিপ্লবীদের জন্য গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। দুই বছর পর তিনি আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতে আসতে গিয়ে গ্রেফতার হন। তাঁকে ও সঙ্গী বিপ্লবী গুরুমুখ সিংকে আফগান সরকার রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। এবার তিনি সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে ফ্রান্স হয়ে জাহাজে পন্ডিচেরি এসে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন।

পৃথ্বী সিং বম্বেতে এসে বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাঁর আত্মগোপনের জীবন চলতেই থাকে। পার্টির নির্দেশে কিছু দিন তিনি কলকাতাতেও ছিলেন। আবার বম্বে ফিরে যান। এই সময় তিনি শুনতে পান তার বন্ধু বিপ্লবী গুরুমুখ সিং ধরা পড়েছেন। এই খবর শুনে তিনি মনে করেন যে এই পলাতকের জীবন, ছদ্মবেশের দ্বারা দেশ কি কোনওভাবে উপকৃত হয়েছে? সর্বদা পুলিশের ভয় নিয়ে গোপন জীবনযাত্রা তার তখন অর্থহীন মনে হয়। তিনি যদি কারও বাড়ি বা আশ্রয় থেকে ধরা পড়েন তাহলে সে কীরকম পুলিশি অত্যাচারের শিকার হবে তাও তিনি চিন্তা করেন। পৃথ্বী সিং লিখেছেন, 'আমি অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করলাম এমন কী কমিউনিষ্ট বন্ধুদেরও জানিয়ে দিলাম, চোর-ডাকাতের মতন জীবন কাটানো আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সবাই আমাকে গান্ধিজির কাছে যেতে পরামর্শ দিয়েছিল।'

১৯৩৮ সালের মে মাসে পৃথ্বী সিং আজাদ পট্টভি সীতারামাইয়ার ব্যবস্থাপনায় গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি লিখেছেন, গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটা স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। কিন্তু কেউই আসেননি। তাতে তিনি মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। গান্ধিজি পৃথ্বী সিং-এর জবানবন্দি দীর্ঘসময় ধরে শোনেন। তিনি বলেন, 'তুমি যা বললে সেগুলি একটি কাগজে লিখে আগামীকাল আমাকে দিও'। পরদিন গান্ধিজি ওই বিবরণী মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'পৃথ্বী সিং তুমি সত্যিই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে বিপজ্জনক। তোমার মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। তবে আরও চিন্তার বিষয় তোমাকে ওরা আদৌ বেঁচে থাকতে দেবে কিনা, এটা ভেবেই আমি বিচলিত'। গান্ধিজি তাকে বলেন, 'আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা কোরো না, গত ষোল বছর যেভাবে কাটিয়েছ সেভাবেই কাটাও। আজ হোক কাল হোক দেশ স্বাধীন হবেই; আর সেই সঙ্গে তুমি তোমার স্বাধীনতা ফিরে পাবে।' পৃথ্বী সিং তাকে বলেন যে তিনি আত্মসমর্পণ করে শুধু নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন না। তিনি প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশীদার হতে চাইছেন। এবং দেশের যুবকদের তিনি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামে নামতে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন। তিনি লিখেছেন, 'মহাত্মাজি আমাকে বললেন, ব্যাপারটা কিছুদিন স্থগিত রাখ, আমাকে ভাবতে সময় দাও, তুমি এ বিষয়টা চিন্তা কর, তারপর যা হয় একটা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

পৃথ্বী সিং-এর অনমনীয় মনোভাবের জন্য গান্ধিজি বোম্বাই (রাজ্য)-এর পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখে জানান যে পৃথ্বী সিং বিপ্লবী, যে একাধিকবার জেল এড়িয়ে পালিয়েছে, সে তার আশ্রমে, এসে আশ্রয় নিয়েছে। ইচ্ছে করলে কমিশনার পৃথ্বী সিংকে এখান থেকে গ্রেফতার করতে পারেন। তবে যেহেতু সে নিজেই ধরা দিচ্ছে, তাই তাকে গ্রেফতার না করে আশ্রমেই থাকতে দেওয়া হোক। কমিশনার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সব জানান। বড়লাট লিনলিথগো তাকে নির্দেশ দেয় অবিলম্বে পৃথ্বী সিংকে গ্রেফতার করতে। ১৯৩৮-এর ১৮ মে দুপুরে পুলিশ এসে ওয়ার্ধা আশ্রম থেকে পৃথ্বী সিংকে গ্রেফতার করে। আশ্রমিকরা ওই সময় প্রার্থনা সংগীত গাইতে শুরু করে। এটাই ছিল তাঁর প্রতি আশ্রমিকদের বিদায় অভিনন্দন। মানু গান্ধি তাঁর একটি ছবি তুলে রাখেন। আশ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন মেরি শ্লয়েড বা মীরা বেন, যিনি পরবর্তীকালে পৃথ্বী সিং-এর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সে অন্য কাহিনি। মহাত্মা গান্ধি ১৯৩৮ সালের মে মাসে 'হরিজন' পত্রিকায় পৃথী সিং এর জীবনকাহিনি প্রকাশ করেন।

পৃথ্বী সিংকে এরপর রাওয়ালপিন্ডি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় ও জেল টিকিটে লিখে দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযায়ী তিনি মুক্তি পাবেন ১৯৬৬ সালে। কিন্তু ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। গান্ধিজির দাবি ও হস্তক্ষেপে বিপুল সংখ্যক রাজবন্দির সঙ্গে পৃথ্বী সিং আজাদও মুক্তি পান। পৃথ্বী সিং গান্ধিজির আশ্রমে ফিরে আসেন।যদিও তিনি গান্ধিজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁর মত ও পথ সর্বাংশে গ্রহণ করেননি। তাঁর বাপুও তাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। দুজনের দুজনকে লেখা চিঠিপত্র গুলি দেখলেই তা বোঝা যায়। আগস্ট আন্দোলনের সময় তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। পৃথ্বী সিং ১৯৪২-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) সঙ্গে ছিলেন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অত্যন্ত দক্ষ ক্রীড়াবিদ ছিলেন। বিশ্ব বর্ষীয়ান খেলোয়াড়দের অলিম্পিকে তিনি ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। পৃথী সিং আজাদের আত্মকাহিনি 'ক্রান্তি পথ কা পথিক' ১৯৬৪ সালে হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্যোগে এর ইংরেজি অনুবাদ 'Prithvi Sing Azad the legendary Crusader An Autobiography' প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে ১৯৯০ সালে। বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ ১৯৮৯ সালে ৯৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(ক্রমশ)

অনিবার্য কারণে 'জরুরি অবস্থা' সম্পর্কে প্রকাশিতব্য ধারাবাহিক নিবন্ধটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলনা। নিবন্ধটি পরের সংখ্যায় পুনরায় প্রকাশিত হবে।

বন্ধুতার পাতা

সঙ্কলনে : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

১৭০৪ সালে
নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ
ঢাকা থেকে বাংলার
রাজধানী সরিয়ে আনেন
মুর্শিদাবাদ-এ, নতুন
রাজধানীকে ঘিরে বদল
ঘটতে থাকে এ-পার
বাংলার অর্থনীতি, সংস্কৃতি,
শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত,
স্থাপত্য, বসন বয়ন।
বাঙালী হিন্দুর সাজপোষাকে
এলো মুসলমানি দর্জির
হাতের ছাঁটকাট, নকশা।
ভাগীরথী তীরের বালুচরের
নতুন শৈলীর রেশমী শাড়ি
বুটিদার বালুচরীর শরীরে
এলো আরবী ফুলের
কারুকাজ।

এলো কাশ্মীরী শালের
'কুনিয়া কেরী' বা আঁচলের
পাশের দুই কোনের কলকা,
মাঝের এক বা তিন চারটে
বড়ো নকশাদার কল্কা,
পরে যা মিশে যাবে
বাঙালী হিন্দু কনের কপাল-
কপোলে কুমকুম চন্দনে।
কেরী বা আরবুটি কল্কা
মিশবে হিন্দু বাঙালীর
আলপনায়, প্রতিবাক
সোনার মোহরে, তারও
পরে ফুলিয়ার শাড়ির
পাড়ে।
বাংলার রাজধানী হয়ে
ওঠার আগে থেকেই
মুর্শিদাবাদ ছিল কোমল
রেশম উৎপাদনে মস্ত
কাশী নগর। গঙ্গামতি, জেলে,
বারোয়ারি, ইংরেজ।

২

আর্মানী, ইংরাজ, ওলন্দাজ,
আবিসিনীয়, ফরাসী
বণিকদের যাতায়াত ও কারবারের
জৌলুস, ক্ষমতা, রাজপদে নিয়োগ,
জমিদারি, মনসবদারির
বনিয়াদ দৃঢ় রাখার অভিলাষ
উচ্চবর্গের বাঙালীর সংস্কৃতিতে
আনলো নবাবী ও বিলিতি
চালের সাজ। এলেন পেশোয়াজ
পাজামা আঙরাখা – পরা বাবু
বিবিরা
কোনো মানুষের রুচি পরিধানে
রাখার [illegible] বিশিষ্ট ভঙ্গিতে
মুসলমানি বাঙালী পরিবারে
এলো শাড়ি, আঁচলে নারী-
পুরুষের প্রতিকৃতি সম্বলিত
বালুচরি শাড়ি, হিন্দু মুসলমান
নির্বিশেষে উচ্চবর্গের রাজপুরুষ,
জমিদার, বণিক সমাজ পরিবারের
বাইরেও উপহার বা কদরদানি
হিসেবে বেছে নিতে লাগলেন
বালুচরি কে।
বালুচরির সে যুগের এমন
শিল্পীরা ছিলেন সমাজের

নিম্নবর্গের মানুষ, বোনার তাঁতি
কৈবর্ত, মাল, বাগদি, চণ্ডাল,
মুসলমান যুগী ও ধুনি
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের।
মুর্শিদাবাদের বালুচরির শ্রেষ্ঠ
নামজাদা কর্মী শিল্পী দুবরাজ
দাস ছিলেন চরকার পরিবারের
সন্তান, শাড়ি শিল্পে তার
গুরু মুসলিম নকশাবন্দ।
এই মুসলমান
নকশাবন্দরা বুটিদার বালুচরী
শাড়ির পাশাপাশি তৈরি
নানা রঙের সুতো দিয়ে
হরিনাম সম্বলিত নকশা
পাড়ের সিল্কের কাপড়ে
নামাবলী শাড়ির জন্ম।
তখন বাংলার ভূলোকে
চৈতন্যদেবের ভক্তি ও
সাম্যভাবনার
আলো পড়েছে, ছড়িয়ে
যাচ্ছে অন্তঃস্থ হিন্দু ও
মুসলমানের সংসারে।।
আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ই ২০২৬

বালুচরী শাড়ির শরীরে
বেঁচে আছে বাংলার
অসাম্প্রদায়িক সবিনা/দেবাল বসু

প্রসার ভারতী এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ আয়োজনে সম্প্রতি হওয়া আকাশবাণী সংগীত সম্মেলনে খেয়াল, ঠুমরী ও দাদরা গাইলেন সাবিনা মুমতাজ ইসলাম। সংগত করলেন হারমোনিয়ামে রূপশ্রী ভট্টাচার্য, তবলায় অশোক মুখোপাধ্যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ময়দান ঘুরে ঘুরে উঠতি ক্রিকেটার তুলে আনার কাজে অনন্য আব্দুল মুনায়েম। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মুনায়েমকে বই পাঠিয়ে দিয়েছেন। মুনায়েম-এর কাজ ১৪-১৫ বছর বয়সের ক্রিকেট খেলোয়ার খুঁজে বের করা যারা ১৮ বছর পার করে বাংলার হয়ে খেলতে পারবে।

এই সময়, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বীরভূমের সাঁইথিয়া গার্লস স্কুলের শরীর শিক্ষার শিক্ষক মুখলেসুর রহমান অবসর নিয়েছেন ২০২২ সালে। এই অবসর নেওয়া খাতায় কলমে। এখনও রোজই স্কুলে গিয়ে ক্লাস নেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা, রসায়ন বিষয়ে। শরীর শিক্ষার পাশাপাশি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর তিনি।
হেডমাস্টার জগদ্বন্ধু রায়ের কথায় — অবসরের পরেও উনি স্কুলের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশিয়ে থাকার দিক এমন মানুষ পাওয়া কঠিন।
ছুটির পরে প্রতি বিকেলে স্কুলের মাঠে ছাত্রীছাত্রদের কবাডি, নানা স্পোর্টস, অ্যাথলেটিক্সে প্রশিক্ষণ দেন। সেই প্রশিক্ষণ তাদের একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে।

এই সময় ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

৪

শান্তিনিকেতনের
কলাভবনের সতীর্থ
ক'জন শিল্পী বিভেদের
বিচিত্র মাধ্যমের দৃষ্টি
দিয়ে প্রকৃতি প্রদর্শনী
করলেন বিড়লা একাডেমীতে।
এই শিল্পী গোষ্ঠী
কলাভবনে শিল্প শিক্ষায়
ছিলেন ১৯৮৩ থেকে
১৯৮৮ সাল।
এরা এই প্রথম দলীয়
প্রদর্শনী করলেন।
প্রদর্শনীতে ছিল সোহিনী
ধর, নিখিল রঞ্জন পাল,
নিসার হোসেন, সুখেন্দু দে,
মন্টু সিংহ বাওনি, সুব্রত
মুখার্জী, আরও কয়েকজন।
এদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত
শিল্পী, শিল্প শিক্ষক।
প্রদর্শনীটি উৎসর্গ করেছেন
তাদের শিক্ষকদেরকে।
সতীর্থ শিল্পীদের বন্ধুত্ব
বেশ গভীর হয়,
সহযাত্রীরা এক অপরের
পরিপূরক হয়ে উঠে।

আদিত্য বসুর পত্রিকা
১৪/২/২০২৩

কবীরের দোহা

রাম আমার প্রিয়
হিন্দুরা বলে
রহিম — মুসলমানে
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে মরে দুইয়ে
মর্ম কেউ না জানে

তবে কি থাকে মসজিদে
আর হিন্দু থাকে মন্দিরে।
অলখ পুরুষ ঘরের ভিতর
দৃষ্টি সীমার ওই পাশে ॥

হিন্দু বলি যদি বলবো
হিন্দু না, না আমি
মুসলমানও।
দুয়ের মাঝে থাকি,
দুই বোধকে খেলি
একথা সকলেই জানো ॥

বাংলায় কবীরের একগোছা
দোহা, ভাষান্তর : মানব
চক্রবর্তী, ঝাড়খণ্ড, ২০২৩